মহৎ জীবন

ডা. লুৎফর রহমান

আলোকিত মানুষ চাই

মহৎ জীবন

ডা. লুৎফর রহমান

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
SEDAEP

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৩৯৬ জানুয়ারি ১৯৯০

পঞ্চম সংস্করণ অষ্টম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0022-5

ভূমিকা

যে যাই ধারণা পোষণ করে থাকুন-না কেন—এ-কথাটি আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে উজ্জ্বল উপরিকাঠামোর অভ্যন্তরে বাংলাদেশ আজ এক নির্মম অধঃগমনের ঘুণপোকার দৌরাত্ম্যে আক্রান্ত। দৈনন্দিনতার প্রতিমুহূর্তে আমরা ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছি আমাদের মৌলিক অনুভূতি, সমস্ত মূল্যবোধ এবং মাহাত্ম্য। চারিদিকে এত অসংখ্য অগণিত মানুষের মাঝে আজ একটি সম্পন্ন মানুষের স্বপ্ন দেখাও কেমন কল্পনাতীত মনে হয়।

অথচ এই ভয়াবহ শূন্যতা একটি জাতির জন্য অনন্ত সত্য হয়ে থাকতে পারে না। আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে প্রতিটি মানুষের মনে পুনরায় বিবেককে জাগিয়ে তোলা, প্রতিটি মনে একটি অব্যর্থ স্ফুলিঙ্গ তৈরি করা যাতে আমরা পুনর্বার আমাদের নিজস্ব প্রকৃতিকে চিনতে পারি। মুক্ত হতে পারি এই ভয়াবহ দৈত্যের হাত থেকে। আমাদের বিবেক অনুভূতি মূল্যবোধ ও মাহাত্ম্যের পুনর্জাগরণের একমাত্র প্রয়াস হতে পারে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের মধ্যে মানবিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষের বীজ রোপণ করা। ডা. লুৎফর রহমান এমনি একজন লেখক যার গ্রন্থসমূহ আমাদের এই প্রয়াসের সোনালি পাথেয় হিশেবে কাজ করতে পারে।

কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁদের বই পাঠ করা মাত্র মন হাজারো জিজ্ঞাসায় নিজেদের উদাসীন অপূর্ণতাগুলো, অবদমিত কিংবা বিস্মৃতপ্রায় আকাঙ্ক্ষাগুলো যুগপৎ নতুন উৎসাহে ভেতরে ভেতরে কেশর দুলিয়ে গর্জন করে; মনে হয় এই বিশাল পৃথিবীর নিরন্তর কর্মযজ্ঞে আমিও একটু অংশ নিই, স্বার্থপরের মতো শুধুই না নিয়ে যাবার আগে আমিও কিছু দিয়ে যাই জননী পৃথিবীর পায়ে। পৃথিবীর প্রকৃতি, প্রাণী ও মানুষের প্রতি নিদারুণ মমতার ঢেউ তুলে আমাদের জাগিয়ে দিয়ে যায় সেই বইয়ের সোনালি উজ্জ্বল শব্দমালা।

ডা. লুৎফর রহমান তেমনি একজন লেখক যাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় দীপ্ত হয়ে আছে অমনি ধরনের অসংখ্য রত্নরাজি। যারা নবীন পাঠক, অফুরান কৌতূহল নিবারণ করবে, খুলে দেবে মানবিক জীবনের অগণিত সম্ভাবনাময় দরোজা; যে নির্ভয় পথে এগিয়ে গেলে মানুষ নিজেই হয়ে ওঠে এক-একটি সম্পন্ন প্রদীপ; যে প্রদীপের আলোয় সে নিজে তো আলোকিত হয়ই, একই সঙ্গে আলোকিত হয়ে ওঠে পরিপার্শ্বও।

'মহৎ জীবন' গ্রন্থটি ডা. লুৎফর রহমানের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় গ্রন্থগুলোর একটি। বাংলা ভাষায় এমন সরল ও অলংকারবিহীন গদ্যে, এমন স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকথনের ঢঙে মানবকল্যাণমুখী দার্শনিক চিন্তাভাবনা সম্বলিত গ্রন্থ বিরল। তিনি যা লিখেছেন, সেগুলো সত্য বলে আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গেই লিখেছেন, যার ফলে তাঁর উক্তির মধ্যে নির্ভীক দৃঢ়তা আমরা সহজেই লক্ষ করি। নিচের উদ্ধৃতিটির মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

> আমরা মানুষ। রাজা হবার দাবি একমাত্র মানুষেরই আছে। দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞানের আঁধারকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে আমাদিগকে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। কী বিরাট

আলোক, কী অফুরন্ত আনন্দের রাজ্য মানুষের সামনে; মানুষ তার গৌরব ভুলে কী করে আঁধার ও মৃত্যুর পথে হাঁটবে? মানুষকে মহৎ করতে হবে, কারণ মহৎ হবার জন্যই সে এ জগতে এসেছিল। দুঃখ-ব্যথা, মায়া প্রলোভনের ভিতর দিয়ে, সে যে কত বড়, তাই সে প্রমাণ করবে। মানুষ কত বড়, সে কী বিরাট—তার পক্ষে দুর্বলতার পরিচয় দেয়া কত বড় বোকামি, তার কতখানি অপমান হয়। সারা প্রকৃতি মানুষকে কত বড় হবার জন্য ডাকছে, উদার আকাশ, উষা। আলো, বাঁশরীর রাগিণী, মানবকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি, আর্তের অশ্রু মানুষকে কেবলি মহত্ত্বের পথে ডাকছে।

এই হচ্ছেন ডা. লুৎফর রহমান। এখানে তাঁর রচনাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁর গ্রন্থগুলো কেবল এ জাতীয় উদ্দীপ্তময় উপদেশবাণীর সমষ্টি বলে ভাবলে ভুল হবে। তাঁর প্রতিটি কথার সত্যতা আরো প্রত্যক্ষ এবং বাঙ্ময়। পাঠক তার অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গী হিসেবে যাতে সেগুলো গ্রহণ করতে পারে সেজন্যে তিনি প্রত্যেকটি চিন্তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এক-একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা; যে কারণে তাঁর উক্তিসমূহকে ন্যূনতম অবহেলা করাও আমাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সমুদ্রগর্ভে কালোকাই দ্বীপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর সেবক তরুণ দামিয়ান, হযরত মুহম্মদ (স.), হযরত আলী (রা.), নবী সলোমান (রা.), রোমান যুদ্ধের বীর হোরেশিও, প্যানক্রিয়াস, শেক্সপিয়র, এমার্সন—এমনি আরো অনেক মহামানবের জীবনকাহিনী প্রসঙ্গক্রমে বইয়ের পাতায় পাতায় এসে পড়েছে। পড়তে পড়তে মনে হয় Sometimes it is nearly a serman, sometimes it is nearly a short story serma. কেন?—'ধর্মজীবন' নামক অন্য একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে এই কৌতূহল কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত করা যেতে পারে : 'পাপ, মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই, এই-ই ধর্ম। পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। ঈশ্বরের সৈনিক হও। ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার কর ... ।'

এত সুন্দর সুন্দর কথা যিনি শুনিয়েছেন, এত সফল ও তাৎপর্যময় যাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং অভিজ্ঞতাও তেমনি সংগ্রাম ও বৈচিত্র্যে ভরা।

যশোর জেলার মাগুরার অন্তর্গত পারনান্দুয়ালী গ্রামে ১৮৯১ সালে ডা. লুৎফর রহমানের জন্ম। পরিবেশ ছিল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং সচ্ছল। গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কুমার নদী। সনাতন শিক্ষা সম্ভ্রান্ত পারিবারিক পরিবেশ ও সচ্ছলতার ঊর্ধ্বে কুমার নদীর মতোই এক ভিন্নতর প্রবাহের বীজ লুৎফর রহমানের শৈশবেই রোপিত হয়েছিল, যার স্বাতন্ত্র্য সংকেত খুব শিগগিরই তাঁর পরিবার লক্ষ্য করে শিহরিত হয়। বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাস করে কোলকাতায় গিয়ে ইন্টারমিডিয়েটে ভরতি হন তিনি। থাকতেন টেলর হোস্টেলে। এই সময়ে অকস্মাৎ তিনি অপেক্ষাকৃত দরিদ্রঘরের এক মেয়ে আয়েশা খাতুনের প্রেমে পড়েন এবং পিতার বিনা অনুমতিতে তাকে বিয়ে করেন। খবর পাওয়া মাত্র তিনি ত্যাজ্যপুত্র হন। বন্ধ হয় পড়াশোনার ব্যাপারে পিতার আর্থিক সহযোগিতা। জীবনের শুরুতেই বেঁচে থাকার জন্যে তাঁকে নামতে হয় সংগ্রামে। 'অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা' নামের প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'জগৎ ও সমাজ যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁরা যেসব প্রতিভাবান, অসাধারণ, বিশিষ্ট ক্ষমতায় ভাগ্যবান ছিলেন তা নয়। তাঁরা ছিলেন পরিশ্রমী, সহিষ্ণু, সাধক।' এই লেখা তিনি-যে কেবল একটি অনুন্নত জাতির উচ্চতর বোধ সৃষ্টি করার জন্যই নির্মাণ করেছিলেন তা নয়—নিজের সারা জীবন দিয়ে তিনি এগুলো উপলব্ধি করেছিলেন। কোনো

ভাগ্যদেবী কিংবা কোনো নিয়তি তার সৌভাগ্যের দরোজা খুলে দিয়ে যায় নি। সংগত কারণেই তিনি পাস করতে পারেন নি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। পড়াশোনা ছেড়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করতে হয় তাঁকে। কিন্তু দারিদ্র্যের তীব্রতা তাঁকে অনাহারের পর্যায়ে ঠেলে দিলে একসময় টেলর হোস্টেলের অদূরবর্তী খৃস্টান মিশনারিদের কাছে তাঁকে যেতে হয়। এই মিশনারিরা তাদের কাজকর্ম আচরণ ও কথাবার্তায় দারুণভাবে লুৎফর রহমানকে আলোড়িত করেছিল। সমাজের নীচুস্তরের মানুষজনকে, বিশেষ করে নির্যাতিত নারী ও প্রবঞ্চিত পতিতাদেরকে পর্যন্ত তারা মানবিক প্রেমে গ্রহণ করে সমাজে সম্মানীয় আসনে ওঠানোর প্রচেষ্টায় যেভাবে জীবন উৎসর্গ করে যাচ্ছিলেন তার দৃষ্টান্ত লুৎফর রহমানকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। শোনা যায় শুধু ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় তিনি মিশনারিদের কাছে যান নি, খৃস্টানধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য গিয়েছিলেন।

স্বল্পকালীন শিক্ষকতা ছেড়ে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এবং সেইসঙ্গে সাহিত্যে মনোযোগ দেবার জন্য তিনি কোলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি শুরু করেন। কিন্তু মানুষের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে, তাঁর হাতে অর্থ আসলেও সচ্ছলতা কতটুকু আসে সেটি বিচার্য ব্যাপার। মির্জাপুর স্ট্রিটে যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন সেই বাড়িতেই নারীদের, বিশেষ করে পতিতাদের মঙ্গলার্থে তিনি 'নারীতীর্থ' ও 'নারীশিল্প শিক্ষালয়' নামে দুটি কেন্দ্র খোলেন। 'পাপের পঙ্কিল আবর্ত থেকে উদ্ধার করে পতিতাদের মধ্যে স্বাধীন জীবন যাপন করার মোহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং সমাজে তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এ ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন।' নারীর মুক্তির লক্ষ্যে 'নারীশক্তি' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন কিছুকাল। এর মাঝেই চলতে থাকে তাঁর নিজস্ব লেখা। আর্থিক দুরবস্থার কারণে অচিরেই তাঁর 'নারীতীর্থ', 'নারীশিল্প শিক্ষালয়' এবং 'নারীশক্তি' বন্ধ করে দিতে হয়। আর শেষপর্যন্ত এই দারিদ্র্যই নিয়ে আসে তাঁর জন্য এক দুরারোগ্য কালব্যাধি—যক্ষা। নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষয়রোগের রূঢ় আঁচড়ে নিঃশেষিত হয়ে তিনি মাত্র ৪৭ বছর বয়সে পিতৃত্যাজ্য জীবন ত্যাগ করে চলে যান ১৯৩৬ সালে।

কষ্ট এবং যন্ত্রণার কাছে মাথা নত না-করার এই শক্তি ও দৃঢ়তা তাঁর গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিভিন্ন অনুষঙ্গে ছড়িয়ে আছে।

'মহৎ জীবন' ছাড়াও ডা. লুৎফর রহমানের আরো কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থ রয়েছে যা বাংলাসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। 'উন্নত জীবন', 'মানব জীবন', 'সত্য জীবন', 'ধর্ম জীবন', 'মহাজীবন' এবং 'উচ্চ জীবন' সেগুলোর অন্যতম। এছাড়াও তাঁর কিছু উপন্যাস, কবিতা ছোটগল্প এবং অনুবাদগ্রন্থ রয়েছে, কিন্তু উপরোক্ত প্রবন্ধগ্রন্থসমূহের উৎকর্ষ ও সাফল্যের কাছে এগুলো ম্লান।

আমরা বর্তমান গ্রন্থটির সঙ্গে সঙ্গে ডা. লুৎফর রহমানের অন্যান্য গ্রন্থগুলোর একটি কথার সঙ্গে সুর মেলাতে চাই :

> 'তোমার ছোট সুন্দর পরিবারকে নিয়ে দরিদ্র সচ্ছল অবস্থায় জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে যোগ রেখে
> যদি তুমি মরে যেতে পার—তোমার জীবন সার্থক।
> যেখানে আছ, সেখান থেকেই তোমার যাত্রা শুরু হোক—এখান হতেই তুমি তোমার জীবনকে
> বড় করে তুলতে পার।—কোথাও যাবার দরকার নেই।'

শহিদুল আলম

মহৎ জীবন

সমুদ্রগর্ভে মালোকাই দ্বীপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নরনারীকে নির্বাসন দেওয়া হত। কেউ তাদের দেখবার ছিল না, ব্যাধি-যন্ত্রণায়, দুঃখে তাদের জীবন শেষ হত। চারিদিকে সমুদ্র, তার মাঝে আর্ত-নরনারী, বালকবালিকা নিজেদের দুর্ভাগ্য ও আশাহীন, সান্ত্বনাহীন জীবন নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় কাল কাটায়। তারা আল্লাহকে ডাকত না, তাদের কোনো ধর্ম-জীবন ছিল না। তারা নিরন্তর ব্যাধি-যন্ত্রণায় হাহুতাশ করত, আর অদৃষ্টকে অভিশাপ দিত। যাদের জীবনে কোনো আশা নাই, যাদের কেউ শ্রদ্ধা করবার নাই, যাদের দুঃখ-ব্যথার কথা কেউ চিন্তা করে না—তাদের জীবন কত ভয়ানক, কত দুঃখময়, কত শোচনীয়!

এই অভিশপ্ত ও নির্বাসিত নরনারীর জন্য কার প্রাণ অস্থির হয়েছিল? তাদের দুঃখের জীবন কার প্রাণে চিন্তা সৃষ্টি করেছিল? কে এই নির্বাসিতদের মাঝে যেয়ে তাদের সেবা করবে? তাদিগকে সান্ত্বনা দেবে? তাদিগকে আল্লাহ ও মহৎ জীবনের কথা শোনাবে? তারা যে অভিশপ্ত! কে যাবে সেই দুঃসহ ব্যাধির সংস্পর্শে? তাদের কাছে যাওয়ার অর্থ—নিজের জীবনের সকল আশা-ভরসা জলাঞ্জলি দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে কুষ্ঠব্যাধিকে বরণ করে নেওয়া।

দামিয়ান নামক এক যুবক বহুদিন হতে এই নির্বাসিতদের কথা চিন্তা করছিলেন। এই সুন্দর আকাশ, এই আলো-গন্ধ-ভরা মানবসমাজ, জীবনের সহস্র ভোগ-আকর্ষণ একদিকে; অন্যদিকে রোগপীড়িত নরনারীর করুণ মুখ, আতুরের গগনবিদারী চিৎকার, আর সীমাহীন আঁধারে ব্যথিতের করুণ মুখেরই জয় হল। জীবনের সকল আশা-কামনাকে বিসর্জন দিয়ে যুবক দামিয়ান নির্বাসিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের সেবার জন্য প্রস্তুত হলেন; বন্ধু প্রতিবাসীদের সমালোচনা, আত্মীয়স্বজনের মিনতি তাঁর সঙ্কল্পকে দমাতে পারল না। দামিয়ান একদিন ফরাসি দেশের উপকূলকে শেষ নমস্কার করে একখানি বাইবেল আর একটা সাগরের মতো বিরাট আত্মা নিয়ে আর্তের সেবায় সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন। অহো! বিরাট মনুষ্যত্ব! যে জীবন সহস্র ভোগের শিক্ষা দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা যেত, সীমাহীন সুখ দিয়ে যাকে ভরে দেওয়া যেত; তা এখন দুঃস্থ নরনারীর চিৎকার-ক্রন্দনের মাঝে ব্যয়িত হতে লাগলেন! দামিয়ান পিতার মতো, মায়ের মতো, বন্ধুর মতো ব্যাধিগ্রস্ত মানুষগুলিকে সেবা করতে লাগলেন। তিনি যখন তাদিগকে নিয়ে সাগরকূলে বসে আল্লার স্নেহের কথা বর্ণনা করতেন, যখন তিনি বলতেন—মানুষের জন্য এক অফুরন্ত আনন্দের রাজ্য আছে, আমরা সেইদিকে যাচ্ছি, ব্যাধিপীড়া দিয়ে খোদা আমাদিগকে তাঁর অসীম স্নেহের পরিচয় দিচ্ছেন; তখন সবাই কাঁদত, আকাশ থেকে ফেরেস্তা আশীর্বাদের অশ্রু দিয়ে তাদের সংবর্ধনা করত, স্তব্ধ সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে বাতাস তাদের শোক-গৌরব গেয়ে ফিরত।

কী মহৎ এই মহাপুরুষের জীবন—কত বড় তিনি ছিলেন!

উনিশ বৎসরের সেবার পর দামিয়ান একদিন বুঝতে পারলেন—কালব্যাধি তাকেও ধরেছে। তিনি সেদিন সকলকে এক জায়গায় করে বললেন, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। আজ তোমাদেরই মতো আমি একজন হয়েছি। এতদিন তোমাদের সঙ্গে আমার ভালো করে আত্মীয়তা হয় নাই—একটু বিভেদ ছিল—আজ খোদা সে বিভেদটুকু তুলে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমায় এক করে দিয়েছেন। আজ তাঁর স্নেহের কথা স্মরণ করে আমাদের চোখে জল আসছে। আজ আমাদের উপাসনা বড় মধুর, বড় সুন্দর হবে।

ক্রমে দামিয়ানের সোনার শরীর ভেঙে এল। অবশেষে এই মহাপুরুষ মানবসমাজে তার মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে একদিন প্রাণত্যাগ করলেন। দামিয়ান মরেন নি—মানুষ চিরকাল তাঁর স্মৃতির সম্মান করবে।

এ জগতে মানুষ নিজের সুখের জন্য কত লালায়িত, মানুষের জন্য মানুষের সহানুভূতি ও বেদনাবোধ কত সুন্দর, কত মহৎ—মানুষ তা কবে বুঝবে? প্রকৃত সুখ কোথায়? পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই সুখটুকু ভোগ করে নেওয়াতে কি সত্যিকারের সুখ আছে? আত্মার সাত্ত্বিক তৃপ্তির কাছে জড়দেহের ভোগ-সুখের মূল্য কিছুই না। যতদিন না মানুষ পরকে সুখ দিতে আনন্দ বোধ করবে, ততদিন তার যথার্থ কল্যাণ নাই। আর্ত-ক্ষুধিত আমার সামনে আঁখিজলে ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি কোন্ প্রাণে আনন্দ-উৎসবে যোগ দেব? আর্তের দুঃখের মীমাংসা চাই, ক্ষুধিতের শান্তি চাই।

মানুষের জড়দেহের ব্যথার জন্য যে-বেদনাবোধ, এছাড়া আর-একপ্রকার বেদনাবোধ আছে। জ্ঞান ও অজ্ঞানে মানুষের আত্মার যে-অবনতি ঘটে, তা দেখে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা যে-বেদনাবোধ করেন, তাও সমান মহত্ত্বের পরিচায়ক। আত্মার দারিদ্র্যও মানুষের শরীর ও মন উভয়কেই ধ্বংস করে।

মানুষের পাপ মানবসমাজকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়, তার জন্য অসীম দুঃখ সৃষ্টি করে। পাপী শুধু নিজে পাপ করে না, তার অত্যাচারের আঘাত সহ্য করতে যেয়ে মানবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সে মানুষের চোখ থেকে রক্ত টেনে বের করে মানবহৃদয়ে চিতার আগুন জ্বেলে দেয়, সে জীবন্ত অভিশাপ হয়ে এ জগতে বাস করে। সে নিজের বুকে ছুরির আঘাত করে অথচ সে বুঝতে পারে না সে কী করছে।

মানবসমাজকে বাঁচাবার জন্যে অসীম প্রেমে, অনন্ত ব্যথা-অনুভূতিতে মহাপুরুষেরা পাগল হয়ে যান! তাদের বিরাট স্নেহের কল্যাণ আহ্বানে যারা সাড়া দেয়, তারা সৌভাগ্য লাভ করে।

আরব সমাজের পাপ আর ব্যথিতের মর্মপীড়া মহাপুরুষ মোহাম্মদকে (স.) কাঁদিয়েছিল—তিনি 'মানুষ মানুষ' বলে পথে বের হয়েছিলেন।

যুবক বুদ্ধের প্রাণে মানুষের দুঃখ ও ব্যথা কী অসীম বেদনা সৃষ্টি করেছিল—কত সুখ, কত বিলাস ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে মানুষের দুঃখ-বেদনার মীমাংসার জন্য তিনি বনে বনে ছয় বৎসর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর শরীরের উপর দিয়ে গাছ হয়ে গিয়েছিল। কী বিরাট মনুষ্যত্বের গৌরব দিয়ে খোদা তাঁকে এ জগতে পাঠিয়েছিলেন।

মানুষ যখন মহামানবতার পরিচয় দেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে খোদার আসন দিয়ে থাকে। এতে মহামানুষদিগকে অপমান করা হয়। নারায়ণ হয়ে মহাপুরুষদের মোটেই তৃপ্তি হয় না, তারা চান—মানবদুঃখের অবসান, অসত্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধে মানবসমাজের বিদ্রোহ।

মহামানুষেরা যদি মানব-সাধারণের কাছ থেকে নারায়ণ উপাধি পান, তাতে তাঁদের জীবনের বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

জীবনে মহৎ হয়ে লাভ কী?—কেননা আমরা মানুষ। রাজা হবার দাবি একমাত্র মানুষেরই আছে। দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞানের আঁধারকে দুইহাত দিয়ে ঠেলে ফেলে আমাদিগকে উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বে উঠতে হবে। কী বিরাট আলোক, কী অফুরন্ত আনন্দের রাজ্য মানুষের সামনে! মানুষ তার গৌরব ভুলে কী করে আঁধার ও মৃত্যুর পথে হাঁটবে? মানুষকে মহৎ হতে হবে, কারণ মহৎ হবার জন্যে সে এ-জগতে এসেছিল। দুঃখ, ব্যথা, মায়া, প্রলোভনের ভিতর দিয়ে, সে যে কত বড়, তাই সে প্রমাণ করবে। মানুষ কত বড়, সে কী বিরাট, তার পক্ষে দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া কত বড় বোকামি, তার কতখানি অপমান হয়। সারা প্রকৃতি মানুষকে বড় হবার জন্যে ডাকছে—উদার আকাশ, উষার আলো, বাঁশরীর রাগিণী, মানবকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি, আর্তের অশ্রু মানুষকে কেবলই মহত্ত্বের পথে ডাকছে। মিথ্যা এ জীবন, এ সুখ, এ বিষয়-বৈভব। জীবনে যে সৎকার্য করা যায়, তা-ই মানুষকে তৃপ্তি দিতে সক্ষম। দালানকোঠা হাতিঘোড়া শত শত বিলাস উপহার—কিছুরই মাঝে মানুষের তৃপ্তি নাই।

রানি ভিক্টোরিয়া একবার একখানা মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করতে যেয়ে সজলনয়নে ডিউক অব ওয়েলিংটনকে জিজ্ঞাসা করেন—ডিউক, সত্যই কি এই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হবে? একে কিছুতেই রক্ষা করা যায় না?

ডিউক অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—না মহারানি, এই ব্যক্তি তিনবার আইন অমান্য করেছে।

যার মৃত্যুর আদেশ দিতে হবে, সে ছিল একজন সৈনিক, সে তিনবার যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিল। সৈনিকের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়া গুরুতর অপরাধ, এতে তার প্রাণদণ্ড হয়।

মহারানি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে এই ব্যক্তির সপক্ষে কিছুই আপনার বলবার নাই?

ডিউক বললেন—লোকটি সামরিক আইন অমান্য করলেও এর স্বভাব বড় ভালো।

দয়াবতী রানি তখনই কাগজের উপর লিখলেন—এর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করা গেল।

হযরত আলীর (রা.) সঙ্গে এক ব্যক্তির লড়াই হয়েছিল। লোকটির গায়ে অসীম শক্তি ছিল, মুসলমান-সাম্রাজ্যের খলিফাও কম শক্তিশালী ছিলেন না। হযরত আলী তাকে যখন মাটির উপর ফেলে হত্যা করবেন, তখন সে হঠাৎ খলিফার মুখে থুতু ফেলে দিল। খলিফা তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—এখন যেতে পার, তোমায় আর আমি কিছু করব না।

লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এই ব্যবহারের কারণ কী? হযরত আলী বললেন—ঘৃণা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে আমি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি নি। তুমি দুষ্টু, মানবসমাজের সমূহ অকল্যাণ করেছিলে, তাই তোমাকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। যখন আমার মুখে তুমি থুতু দিয়েছিলে, তখন আমার মনে ক্রোধ হয়েছিল। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আল্লার মানুষ আমি হত্যা করিনে।

হযরত আলীর এই চরিত্র-মহিমা মানুষের মনকে কত পবিত্র করে দেয়; আত্মবুদ্ধি কত উপরে টেনে তুলে!

গুজরাটের রাজা আহম্মদ শাহের জামাতা একসময় একটা মানুষ খুন করেছিল। হত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরা যখন বিচারকের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করল, তখন

বিচারক ভাবলেন—জামাতার অপরাধের শাস্তি দিলে সম্রাট আমার ওপর রুষ্ট হতে পারেন। এই চিন্তা তার বিবেকবুদ্ধিকে দুর্বল করে দিল। তিনি নিজের আসনের অবমাননা করে বাদশাহের জামাতাকে বিশেষ কিছু শাস্তি দিলেন না। আহম্মদ শাহ যখন শুনলেন—তার দরিদ্র প্রজা ন্যায়বিচার পায় নি, তখন তার ভিতরকার মানুষ করুণ ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। তিনি বিচারককে ডেকে বললেন—সাহেব, বিবেকবুদ্ধিকে অবহেলা করে ন্যায়বিচারকে অবমাননা করে, আপনি কী করে আমার নরহন্তা জামাতাকে মুক্তি দিলেন?

বিচারক লজ্জিত হয়ে বললেন—সম্রাট, আপনার জামাতা বলেই তাকে কিছু বলি নি, অন্য কেউ হলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতাম।

সম্রাট বললেন—এর নাম কি বিচার? আমি যদি অন্যায় করতাম, তাহলে আমাকেও কি আপনি আইন অমান্য করে মুক্তি দিতে পারতেন? আপনি আপনার সুবুদ্ধিকে ভয় করুন, আমাকে ভয় করবেন না। পাছে কী মনে করি, এই ভয়েই হয়তো অপরাধীকে শাস্তি দিতে আপনি কুণ্ঠিত হয়েছেন। আমি কাপুরুষ বা অত্যাচারী রাজা নই। যার স্নেহের ধনকে আমার জামাতা হত্যা করেছে—তার শত্রুর কি কোনো মূল্য নেই?

আহম্মদ শাহ্ অবিলম্বে জামাতার পুনর্বিচার করে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

মহৎ ব্যক্তির কাছে সকলেই সমান, আপন-পর নাই। অন্যায় যে করেছে, সে আপন রক্তের কেউ হলেও তিনি তাকে শাস্তির হাত হতে রক্ষা করতে পারেন না।

তুমি অত্যাচারী বড় মানুষ আছ, তুমি গোপনে কোনো দরিদ্রের সর্বনাশ করেছ, তুমি আমার মিত্র, তোমার পত্নীর সঙ্গে আমার পত্নীর আলাপ আছে; তাই বলে কি তোমার সপক্ষে আমি কোনো কথা বলতে পারি? আমি আঁখিজলে তোমার ধ্বংসের ব্যবস্থা করব। তুমি মিত্র বলে আমার বেশি আত্মীয় নও, মানব মাত্রেই আমার আত্মীয়। যে অত্যাচারী, যে মিথ্যার উপাসক, যে হীন দুর্বৃত্ত, সে আমার আত্মীয় হলেও আমার কেউ নয়।

যে মহৎ, যে বড়, তাকে প্রশংসার লোভ না করেই বড় ও মহৎ হতে হবে। জাতির মধ্যে যখন বড় চরিত্র ও উন্নত-জীবনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন জাতির দুরবস্থার কথা ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়। কতগুলি কাপুরুষ, মূর্খ ও হীন মনুষ্যের জীবন জাতির দেহে শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম নয়। জাতির শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে তখন—যখন তার সন্তানগুলি মহত্ত্বকে সম্মান করতে শিখবে, যখন তারা ন্যায় ও সত্যকে সমাদর করতে জানবে।

জীবনে সবসময় ছোটবড় সকল কাজে মহত্ত্ব ও সুন্দর চরিত্রের পরিচয় দিতে হবে।

শত্রু রোমের দুয়ারে হামলা করেছে। তখনই তারা পঙ্গপালের মতো এসে রোম নগর ধ্বংস করবে। আর তো সময় নাই। নদীর ব্রিজ ভেঙে দিতে পারলে রক্ষা পাওয়া যায়—নইলে আর কোনো উপায় নাই। যুবক হোরেশিও বললেন, দেশের সম্মান রক্ষা করবার জন্য কে কে প্রাণ দেবার জন্যে আমার সঙ্গে যাবে—মৃত্যু অবধারিত; কারণ পেছন থেকে ব্রিজ ভেঙে দিলে আমরা আর কিছুতেই ফিরতে পারব না। মরতে আমাদিগকে হবেই।

দুইজন বীর যুবক হোরেশিওর সঙ্গে গেল—ব্রিজ ভাঙার জন্য আরো বহু মানুষ তাদের সঙ্গে গেল। পেছনের লোকদিগকে হোরেশিও চিৎকার করে বললেন, আমরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে শত্রুদের গতিরোধ করছি, তোমরা পিছন থেকে ব্রিজ ভেঙে দাও।

শত শত লোক মুহুর্মুহু ব্রিজের উপর আঘাত করতে লাগল। সম্মুখের অগণিত সৈন্যের সামনে তিন বীর যুবক প্রাণপণ শক্তিতে ব্রিজকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

শত্রুদল ব্রিজের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে দেখল, ব্রিজ ভেঙে দেবার চেষ্টা হচ্ছে—রোম নগরে প্রবেশ করবার এই একমাত্র পথ। ব্রিজ ভেঙে গেলে তাদের অভিযান ব্যর্থ হয় যাবে। কোনোরকমে নগরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। সেনানায়ক হুকুম দিলেন—আর বিলম্ব নয়। হোরেশিও আর তার দুই সহযোগীর কুঠারকে ভয় করো না। ব্রিজ ভেঙে গেলে আর আমাদের অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।

হোরেশিওর দুঃসাহস দেখে মুহূর্তের জন্য শত্রুরা একটু হেসে নিল, এতবড় সৈন্যবাহিনীর সামনে মাত্র তিনটি বীর। কী উন্মত্ততা!

শত্রুরা হোরেশিওকে শত শত অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে দুইহাত দিয়ে দীর্ঘ কুড়ালের বাঁট ধরে হোরেশিও শত্রুদলকে আঘাত করতে লাগলেন। সে কী ভীষণ দৃশ্য! কী অমানুষিক শক্তিপরীক্ষা। সিংহের সামনে মেষপালের যেমন অবস্থা হয়, বিক্রম-উন্নত বীরবর হোরেশিওর সামনেও শত্রুদের তেমনি অবস্থা হতে লাগল। আর কিছুক্ষণ লড়তে পারলেই কাজ হাসিল হয়, আর পনেরো মিনিটেই ধ্বংসকার্য শেষ হবে। হোরেশিও প্রাণপণ শক্তিতে লড়তে লাগলেন, যায় প্রাণ যাবে, দেশের লক্ষ নরনারীর স্বাধীনতা সম্মান তার হাতে। এতবড় মহত্ত্বের পরিচয় দেবার সুযোগ আর আসবে না।

পার্শ্বেই দুইব্যক্তি অবসন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর পাঁচমিনিট হলেই কাজ হাসিল হয়।—

এইবার ব্রিজ বজ্রের শব্দে নদীর মধ্যে ভেঙে পড়ল। হোরেশিও কুড়ুল দূরে নিক্ষেপ করে খরস্রোত স্রোতস্বিনীর মাঝে ঝাঁপ দিলেন। দেশকে রক্ষা করা হয়েছে, এইবার মরণেও আনন্দ!

তীরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য নরনারী আনন্দ-চিৎকারে গগন কাঁপিয়ে তুলছিল। রোমবাসীরা তীর হতে নৌকা নিয়ে অগ্রসর হল। শত্রুরা অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল।

মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া মানুষের পক্ষে যদি অসম্ভবও হয় তবু সে নীচতার পরিচয় কেন দেয়? জীবনকে পাপ ও অন্যায়ে কলঙ্কিত কেন করে? দিনে-দুপুরে মানুষের মাথায় বাড়ি দেওয়া, পত্নীর ওপর অত্যাচার করা, ব্যভিচার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, পত্নীর দাবিকে অগ্রাহ্য করে চরিত্রহীন হওয়া—এইগুলিকেই শুধু পাপের পূর্ণ চিত্র বলা যায় না। মানুষের শতরকমে পতন হয়, শতরকমে সে তার মনুষ্যত্বের অপমান করে। নিজকে অপমান করবার মতো লজ্জা মানবজীবনে আর কী আছে? আত্মসর্বস্ব হয়ে জীবন কাটানো, জ্ঞানাবদ্ধ মানুষের দুঃখ পাপকে সহ্য করে, নিজের ও জাতির মূর্খতায় কিছুমাত্র কষ্ট বোধ না করা—নিকৃষ্ট মানুষের স্বভাব।

একসময়ে এক বালক কোনো শহরের পথে বসে কাঁদছিল। সে বাড়ি হতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছিল, হাতে তার একটি পয়সাও ছিল না। তখন ছিল শীতকাল, শীতের কাপড়ও সঙ্গে ছিল না, এর ওপর বালকের গায়ে জ্বর এসেছিল। সে সেই অপরিচিত দেশে কাউকেও চিনত না, কারো কাছ থেকে কেমন করে সাহায্য চাইতে হয়, তাও সে জানত না। পথিকেরা কয়েকবার তাঁর কাঁদবার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল; কিন্তু বালক উত্তরে কিছুই বলতে পারে নি।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। শীতে আর শারীরিক কষ্টে বালকটি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হল—মায়ের মুখখানি মনে করে তার চোখদুটি জলে ভরে উঠেছিল। কাছে-কিনারে লোকজনের বিশেষ বসতি ছিল না। খোদা সব জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন—এ তোমরা বিশ্বাস কর। মানুষের জীবনের দুঃখ দেখলে তিনিও দুঃখবোধ করেন, তখন তিনি ব্যথা পেয়েও কিছু করেন না। মানুষ ইচ্ছা

করে পাপ বরণ করে নেয়, খোদা তার গতিকে রোধ করেন না। এইরূপ করলে তাঁর সৃষ্টির আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। খোদা কতবার আঁখিজলে মানুষকে 'আয় আয়' বলে ডাকছেন, অবোধ মানুষ তা দেখে না। খোদা জলে, স্থলে, সারা পৃথিবীর পথে পথে মানুষের জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছেন। মানুষ তা জানে না।

একটা রমণী কী একটা কাজে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বালকের রোদন শুনতে পেলেন। নারীর প্রাণ—স্নেহমমতায় ভরা। রমণী বালকের নিকটে এসে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা তোমার কী হয়েছে? বালক মায়ের মতোই এক নারীমূর্তিকে দেখে কথা বলতে সাহস পেল। সে বললে—মা, তোমার মতোই বাড়িতে আমার এক মা আছেন। তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম, এখন বিপদের একশেষ হয়েছে। শীতের দিনে গায়ে কাপড়চোপড় নেই, গায়ে জ্বর এসেছে, অজানা অচেনা দেশ, কোথায় যাই। মায়ের অবাধ্য হয়ে এখন আমাকে পথে পড়ে মরতে হল।

নারী বললেন—তোমার কেউ না থাকুক, আমি আছি। আমি তোমার মা। চল আমার সঙ্গে, বেশি দূর নয়। কাছেই আমার বাড়ি।

বালক : মা, আমার তো ওঠবার সাধ্য নাই, হাত-পাগুলি হিম হয়ে ভেঙে আসছে।

আচ্ছা, তাহলে আমার কোলে এসো, এই বলে রমণী বালককে কোলে তুলে নিলেন। বালককে বুকে নিয়ে নানা সান্ত্বনার কথা বলতে বলতে রমণী বাড়িতে এলেন। ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে সেখানে বালককে শোয়ালেন। সে-রাত্রি আর তার খাওয়া হল না—সারারাত্রি বালকের বিছানার পাশে বসে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছিল। আহা! কার এ ব্যথার ধন। এই অজানা দেশে পথে পড়ে মরছিল। ভাগ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে এর কী অবস্থা হত?

পরদিন রমণী নিজের খরচে ডাক্তার ডাকলেন। অনেক সেবাশুশ্রূষায় অবশেষে বালক বেঁচে উঠল। রমণীটিও আনন্দে ভাবলেন—আমার কষ্টস্বীকার সার্থক হল। এখন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যাক।

আরো কয়েকদিন পরে রমণীটি বালককে কিছু রাস্তাখরচ আর একখানা নূতন কাপড় দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত হলেন। প্রাণের কৃতজ্ঞতায় চোখের জলে রমণীর আঁচল ভিজিয়ে বালক বাড়ির পথে রওনা হল।

ব্যথিত বিপন্ন মানুষকে যে একটা স্নেহের কথা বলছে, সেই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে। মানুষ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, যখন রোগ-যন্ত্রণায় তার শরীর ভেঙে আসে, যখন সে মরণপথের যাত্রী—তখন তার সেবাশুশ্রূষা করাতে যথার্থ মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। বিপন্ন ব্যক্তি পরিচিত হউক, আর অপরিচিতই হউক, তাকে আপন বলে বুকে টেনে নিতে হবে। মানুষমাত্রই মানুষের আত্মীয়—এ যে মনে করতে পারে তার ধর্মবিশ্বাসের মূল্য খুব বেশি। সারা পৃথিবীর বিপন্ন মানুষকে তুমি টেনে কাছে আনো, এত বড় দাবির কথা বলবার সাহস আমার নেই—কিন্তু তোমার চোখের সামনে যে মরে যাচ্ছে তার দিকে তুমি ফিরে তাকাবে না? তোমার কানের কাছে যে আর্তনাদ করছে তার পানে কি তুমি একটুও অগ্রসর হবে না?

সিরাজগঞ্জে এক কাঠঅলার কলেরা হয়। বাজারের এক পতিতা নারীকে তার সেবা করতে দেখেছিলাম। সেই পতিতার মধ্যে দেখেছিলাম আমি—নারীর মাতৃমূর্তি, সে কী পবিত্র দৃশ্য! শ্রদ্ধাভক্তিতে আমার মাথা নত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখ খুলে কিছুই প্রকাশ করতে পারি নি।

নারীর মাতৃমূর্তি কত সুন্দর, কত পবিত্র! মাতৃরূপিণী নারীজাতির যখনই আমরা অপমান দেখি, তখন মন দুঃখিত হয়ে ওঠে। সে হিন্দু কি মুসলমান, সে-কথা ভাববার অবসর থাকে না।

এক ব্যক্তির কথা জানি, তিনি একসময়ে একজনের কাছ থেকে একআনা পয়সা ধার নিয়ে কী একটা জিনিস কিনেছিলেন, কাছে তখন পয়সা ছিল না। বাড়ি এসে টাকা ভাঙিয়ে সেই লোকটিকে পনেরো আনা দিয়ে নিজে মাত্র একআনা রাখলেন। লোকটি বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনি আমার কাছ থেকে মাত্র একআনা নিয়েছেন, এখন পনেরো আনা দিচ্ছেন কেন? আপনার ভুল হয়েছে। ভদ্রলোক বলেন—বাকি পনেরো আনা তোমাকে দিলাম, ওটা তোমার নিতেই হবে। লোকটি অগত্যা সে পয়সা নিতে বাধ্য হল।

এখানে এই ভদ্রলোকের চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। জ্ঞান ব্যতীত মানুষের কোনো জায়গাতেই কল্যাণ নাই, কেমন করে যে উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতে হয় তা সে বুঝতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানের আসন সর্বোপরি। ভদ্রলোকের প্রাণের প্রশংসা না করে পারি না। তার নির্মল সুন্দর আত্মাটি আমাদের ভক্তি পাবার যোগ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়। তার এই দান সত্যই কি মানবজাতির অনুকরণের জিনিস? আমার মন ভয়ে সঙ্কোচে উত্তর দেয়—না।

মানুষকে দান কর, কিন্তু দান করবার জন্যই কি দান করতে হবে? দেখতে হবে প্রদত্ত পয়সায় দানপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রকৃত উপকার হবে কিনা। যার আছে, তাকে আরো দিলে পয়সার অপব্যবহার করা হয় না কি? সে সেই পয়সা পেয়ে আনন্দলাভ করতে পারে, কিন্তু সে আনন্দটুকু তার না হলেও বিশেষ ক্ষতি আছে বলে মনে হয় না। এইসব টাকা দিলে জাতির কত কল্যাণ হয়, অজ্ঞান মূর্খ লোকেরা তা বোঝে না! অগণিত টাকা ব্যয় করে তারা মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। মানুষকে সবার আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে,জ্ঞানের দ্বারা মানুষ তার জীবনের সকল কর্ম ঠিক করে নিতে পারে—তাকে বলে দিতে হয় না, এই পথে তুমি চল। জ্ঞান যার নেই, সে কিছুই বোঝে না, মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয় একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি খুব ব্যস্ততার সঙ্গে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন, যেন তাকে মারতে তাড়া করছে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার স্থির হলেন। সঙ্গের বন্ধুটি ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—ভাই, এক ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমি জানি তার অবস্থা বড় শোচনীয়, টাকা দেবার কোনো সঙ্গতি নাই। আমার দিকে তিনি আসছিলেন, আমি কোনো গতিকে পাশ কাটিয়ে সরে এসেছি। আমাকে দেখলে তার ভারি লজ্জা হত। ভদ্রলোককে কী করে লজ্জা দেব, এই ভেবেই আমি পালিয়ে এলাম।

এমন করে পরের লজ্জার ব্যথাকে অনুভব করবার ক্ষমতা কয়জনের থাকে? সাধারণত মানুষ সবসময়ই মানুষকে লজ্জা, ব্যথা দিতে আনন্দবোধ করে।

জাতি বল, বংশ-মর্যাদা বল, মহত্ত্বের তুলনায় কিছুই কিছু নয়। মানুষ যেখানেই চরিত্র-মাহাত্ম্য দেখে, সেখানেই ভক্তিতে তার মাথা নত হয়। বড়লোক বলেই কি মানুষ বেশি শ্রদ্ধা পাবার উপযোগী? বড়লোককে মানুষ লাভের আশায় শ্রদ্ধা দেখাতে পারে, কিন্তু কুস্বভাব লোক কখনো মানুষের অন্তরের রাজা হতে পারে না। মানুষ ছোট হোক, বড় হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, যখনই তার মধ্যে মহত্ত্ব দেখব, তখনই তাকে আমরা শ্রদ্ধা করব। ছোটলোক বলে সমাজে যে সর্বনিম্নস্তরে পড়ে আছে সে কি মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে না?

আমি দেখেছি ব্যথিত মানুষের গৌরবদীপ্ত মুখ, সে মুখ কত সুন্দর। কত পবিত্র! রূপ যদি মানুষের থাকে, তবে তা মহত্ত্বের আলোকভরা মুখেই আছে। রূপবান রূপময়ী নরনারীর নীচাশয়তা তাদের রূপকে কতখানি কুৎসিত করে, তাও আমি দেখেছি।

যা বিশ্বাস করি, মানুষের ভয়ে অথবা লাভের আশায় তা বলতে ভয় করা, কত বড় দুঃখের বিষয়! এই অবিচারটুকু জয় করবার জন্যেই মানুষ স্বাধীনতা চায়। বিশ্বাসকে যে যতখানি চেপে রাখে সে ততখানি দরিদ্র। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, তিনি কিছুতেই জীবনের সত্যকে এমনভাবে ব্যর্থ করে দিতে চান না। এতে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

অনেক টাকা মাইনে পাই, সেই লোভে কী করে আমি আমার কোটিটাকার আত্মাটিকে বিক্রয় করতে পারি? আমার দুর্জয় মনুষ্যত্ব, আমার জীবনের উচ্চসার্থকতা আমি কোনো জিনিসের বিনিময়েই নিরর্থক করে দিতে পারি না। অর্থ অর্জন করে শরীরকে বাঁচানো হবে, অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকদের কাছে খুব প্রশংসা লাভ করা যাবে, বন্ধুবান্ধবেরা আমার সুনাম গান করবে; কিন্তু তাতে যদি আমার আত্মার ভাষা নীরব হয়ে যায়, আমার মনুষ্যত্ব নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, তাহলে আমি আমার শরীরকে বাঁচাতে চাই না, আমি কারো প্রশংসা, কারো সুনাম পাবার লোভ করি না।

তখনো হযরত মোহাম্মদ (স.) তাঁর সংস্কারের বাণী নিয়ে জগতে আসেন নি। রোম নগরে এক বাড়িতে বসে একদিন এক মহিলা সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। বাড়িতে তিনি একাকিনী ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি দরজার দিকে চাচ্ছিলেন কেউ দরজা ঠেলে ভিতরে আসে কি না।

তখন ছিল হযরত ঈসার (আ.) যুগ। রোমের যারা মূর্তিপূজা ছেড়ে হযরত ঈসার (আ.) সত্যধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের ওপর ভারি অত্যাচার হত। কোনোরকমে যদি শাসক সম্প্রদায়ের কেউ জানতে পারত কোনো ব্যক্তি ঈসার (আ.) ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখনই তাকে বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া হত। নানা নির্যাতনে তাকে মেরে ফেলা হত। ফলে নব ধর্মাবলম্বীদিগকে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস গোপন করে রাখতে হত। যারা তা পারত না, তাদের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। এইভাবে বহু ধর্মপ্রাণ রোমবাসীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। যে নারীর কথা বলছিলাম,—এর স্বামী কিছুদিন আগে ধর্মবিশ্বাসের জন্যে শহীদ হয়েছিলেন।

প্রাণভয়ে মানুষ নিজের বিশ্বাস ও সত্যকে অনেক সময় গোপন করে চলে, কিন্তু সামান্য লাভে বা কল্পিত সুখের জীবনের জন্যে যে নিজেকে অবনমিত করে, নিজের মনুষ্যত্ব ও বিবেকবুদ্ধিকে বিসর্জন দেয়, সে কিরূপ মানুষ!

মহিলাটির একটি ছেলে ছিল, তাকে রেখে তার পিতা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ছেলেটি বাড়িতে মাকে একাকিনী রেখে প্রত্যহ স্কুলে যেত। স্বামীর একমাত্র ছেলে প্রৌঢ়ার নিঃসহায় নারীজীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, আজ বিদ্যালয় হতে ফিরে আসতে বিলম্ব করছে, তাই তিনি আকুল ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নারীজাতির সন্তানের প্রতি কত মায়া তা আমরা ধারণা করতে পারি না। মায়ের মূর্তিতে নারী কত বড়! নারী দরিদ্রা হোক, পতিতা হোক, সন্তানকে বুকে করে সে রানির আসন অধিকার করে। নারী যখন শিশুর মুখে সুধাধারা ঢালে, তখন তাকে মা বলে সালাম করলে দোষের হয় না। নারীকে যেখানে আঁখিজল ফেলতে হয়, সেখানে অভিশাপের আগুন জ্বলে।

প্রৌঢ়ার হাতের কাজ ভুল হয়ে যাচ্ছিল। ছেলে বাড়ি আসতে দেরি করছে। বাতাস দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেল, প্রৌঢ়া চমকিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, কেউ না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে এমন সময় বালক প্যানক্রিয়াস বাহির হতে 'মা' বলে ডাকল। হাতের কাজ ছুড়ে ফেলে প্রৌঢ়া দরজা খুলে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বাপ, আজ যে তোর এত দেরি হল? বালক বললেন—কেন মা, এত ব্যস্ত হয়েছ? আমার বয়স তো আঠারো।

মা ছেলেকে আঁকড়ে ধরে একখানা চেয়ারের উপর বসলেন। ছেলে মাটিতে মায়ের পায়ের কাছে বসে কোলে বাহু রেখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মা ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আজ কেন এত দেরি হল? তুই তো রোজ বেলা থাকতে আসিস। জানিস তো নিজের দেশে আমরা কতটা প্রবাসী হয়ে বাস করছি! তোর বাপকে রোমবাসীরা হত্যা করেছে—আমার সবসময় মনে ভয় হয়।

ছেলে—মা, কিসের ভয়? বিশ্বাসের জন্য বাপ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এরচেয়ে মোহনীয় মৃত্যু কি আর আছে! আমার যদি অমনি করে মরণ হয়, তাতে আমার জীবন ধন্য হবে।

মা—বাপ, তুই এমন কথা কী করে বললি? তুই যে এখনো আমার দুধের ছেলে! আজ আমার জীবন সার্থক হল। কে তোকে এমন মধুর কথা শিখিয়েছে?

ছেলে—মা, তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ; সত্য ও ন্যায়ের জন্য আমাদিগকে যে-কোনো ক্ষতিস্বীকার করতে হবে। গৌরবময় মরণের মধ্যে দিয়ে যে মুক্তি আমরা পাই, তা কত সুন্দর। মহান মৃত্যু দিয়ে দুঃখময় পঙ্কিল জগতের মাঝ থেকে যদি জীবনের অভিশাপকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে তা মানুষের পক্ষে কতবড় লাভ।

মা—বাপ, তুই আর ছোট ন'স, তুই এখন মানুষের মতোই কথা বলতে শিখেছিস। আজ আমার মনে আনন্দের সীমা নাই। আজ আমার নারীজীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু তোর বাড়ি ফিরতে এত দেরি হল কেন, সে-কথা তো এখনো বললি না।

প্যানক্রিয়াসের মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল। অশ্রুভারে চোখদুটি ছলছল করতে লাগল। বললেন—তুমি আর তা শুনো না।

মার চোখেও জল এল—সন্তানের এতটুকু ব্যথাও যে তিনি সইতে পারেন না। তিনি জিদ করে বললেন—না বাপ, আমার কাছে কোনো কথা গোপন করিস না। কী হয়েছিল বল্?

প্যানক্রিয়াস : আজ স্কুলে একটা সভা ছিল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—পণ্ডিত যিনি, সত্যের জন্য সবসময় মরতে প্রস্তুত থাকবেন। আমি এ সম্বন্ধে সভায় যখন প্রবন্ধ পড়ছিলাম, তখন সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়েছিল। প্রবন্ধ শুনতে শুনতে কেউ কেউ কেঁদে ফেলেছিল। আমাদের শিক্ষক মহাশয়ও কেঁদেছিলেন। প্রবন্ধ পড়বার কালে মনের আবেগে হযরত ঈসার (আ.) নাম করে ফেলেছিলাম, তাই সভা যখন শেষ হয়ে গেল শিক্ষক মহাশয় আমাকে গোপনে ডেকে বললেন—বাবা, দেশের অবস্থা বড় খারাপ। চারিদিকে শত্রুর কান খাড়া হয়ে আছে। এই কথা বলে তিনি চোখ মুছে আমার কাছ থেকে চলে গেলেন।

মা : শিক্ষক মহাশয় কি তাহলে হজরত ঈসাকে (আ.) মানেন? তাঁর চরিত্রবল, তাঁর পবিত্র জীবনের প্রশংসাই এতকাল শুনেছি, তিনি যে এমন করে আত্মগোপন করে আছেন, তা তো বুঝি নি। খোদাকে ধন্যবাদ, তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতেই দিতে পেরেছি। তারপর?

প্যানক্রিয়াস : তারপর আমি আর-আর ছেলেদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে এসে দাঁড়ালাম। নগরের হাকিমের ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। এই ছেলেটি ভারি বদমাইশ। কী কারণে জানি না, এ আমাকে বিষচোখে দেখে। আমি ক্লাসের মাঝে সবার চেয়ে ভালো ছেলে, আর সে ক্লাসের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছেলে। আমার প্রশংসা শুনলে তার যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আমাকে

মোটেই দেখতে পারে না। আমি যে তার কাছে কী অপরাধ করেছি জানিনে, ভারি হিংসুক আর বদছেলে সে। আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—কিহে প্যানক্রিয়াস, তুমি আমাকে ভয় কর না? এই কথা বলে সে বিনাকারণে আমায় ধাক্কা দিলে। আমি বললাম—এরূপ অসভ্যতার পরিচয় দিচ্ছ কেন? সে বলল—দ্যাখ প্যানক্রিয়াস, তুই নানারকমে আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছিস, আমার পায়ে ধরে যদি ক্ষমা চাস তাহলে তোকে ক্ষমা করব, নইলে নয়। রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল, কিছু না বলে আমি চুপ করে রইলাম। তুমি না মা আমায় বলেছ—যে রাগকে জয় করতে পারে, সে-ই মানুষ,—সেই কথা আমি তখন মনে করছিলাম!

মা : তাই ঠিক বাপ।

প্যানক্রিয়াস : মা, এরপর যা ঘটেছে তা আর বলতে পারছিনে—এই কথা বলে প্যানক্রিয়াস কাঁদতে লাগল।

মা ছেলের মাথা বুকের কাছে টেনে বললেন, বাপ, তুই আমার কাছে সব কথা বল।

প্যানক্রিয়াস আবার বলতে শুরু করলে, আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তার রাগ যেন আরো বেড়ে গেল। সেই ছেলেটির নাম কারভিন। কারভিন আবার বলল—প্যানক্রিয়াস, আমি কার ছেলে তা তুই জানিস? ক্লাসে লেখাপড়ায় তুই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তোর অহঙ্কার-ভরা চাউনিগুলি আমার অন্তর বিদ্ধ করে। আচ্ছা এইবার আয়, কার গায়ে কত জোর পরীক্ষা হোক। আমাকে ভয় করতে হবে কি না এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি!

আমি বললাম—তোমার গায়ে আমার চেয়ে বেশি শক্তি আছে। আমি মারামারি করতে পারব না।

মা : এরপর কী হল?

ছেলে : আমি তাকে খুব করে পিটিয়ে দিতে পারতাম। কী কষ্টে যে আমি আমার রাগ দমন করতে পেরেছি, তা আর কী বলব মা। কাপুরুষ গালটা আমার বড্ড লাগে। যার বাপ হৃৎপিণ্ডের রক্ত দিয়ে নিজের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছেন—সে কাপুরুষ! প্রাণে কী জ্বালা উপস্থিত হল তা খোদাই জানেন। ভিতরকার ক্রোধ, শয়তানকে শেষকালে জয় করতে পেরেছিলাম। হেসে বললাম—ভাই কারভিন, তুমি আমাকে অন্যায় করে আঘাত করলে। তবে আমার বিশেষ লাগে নি, একটু রক্ত পড়েছে মাত্র, শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। প্রার্থনা করি তোমার স্বভাবের এই প্রচণ্ড উগ্রতার শীঘ্রই পরিবর্তন হোক। আমাদের শত্রুতার এইখানে অবসান হোক—এরপরে যেন আমরা বন্ধু হতে পারি।

গোলমাল শুনে শিক্ষক মহাশয় সেখানে এলেন। আমি তাঁকে হাতে ধরে অনুনয় করে বললাম—শিক্ষক মহাশয়, কারভিনকে দয়া করে কিছু বলবেন না। ছেলেমানুষি করে এ-কাজ করে ফেলেছে, ওকে ক্ষমা করুন। এজন্য আমি ওর উপর একটুও ক্রুদ্ধ হইনি।

শিক্ষক মহাশয় ভয়ানক চটে ছিলেন। আমার কথায় অগত্যা শান্ত হয়ে গেলেন। এসব কারণে বাড়ি আসতে বিলম্ব হয়েছে। মা, তোমার মনে কি ব্যথা লাগছে? মা, ব্যথার তো কিছু নেই। দেখ দেখি আমি কেমন করে নিজকে জয় করতে পেরেছি, এতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না? পরকে যদি অন্যায় করে ব্যথা দিতাম, তাতেই আমার দুঃখের কারণ হত। যে আঘাত দিয়েছে, তারই লজ্জার কারণ বেশি।

মা অশ্রুসিক্ত চোখে বললেন—বাপ, তোর মধ্যে এত মহত্ত্ব, এত মনুষ্যত্ব জেগেছে? আমার বহু রাত্রির নয়নজলের প্রার্থনা তাহলে খোদা শুনেছেন। তোর বাপকে যেদিন রোমবাসীরা হত্যা

করে, সেদিন তার কণ্ঠের খানিকটা লাল রক্ত আমি সংগ্রহ করেছিলাম, আমার বুকে যে-মাদুলি দেখছিস এর মাঝে সেই রক্তটুকু একটু ছোট ন্যাকড়ায় ভরে রেখে দিয়েছি। আজ আঠারো বছর শয়নে-স্বপনে এই রক্ত আমি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি। তোর বাপের সেই ত্যাগ-মহিমার চিহ্ন আজ তোর গলে পরিয়ে দেব।

এই কথা বলে প্যানক্রিয়াসের মা চোখের জলে কণ্ঠের মাদুলিটি ছেলের গলে পরিয়ে দিলেন।

এর কয়েকদিন পরে রোমবাসীরা যুবক প্যানক্রিয়াসকে ধরে নিয়ে চিতাবাঘ দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল। এ জগতে আগুন, আঁখিজল আর রক্তের ভিতর দিয়েই সত্য ও কল্যাণ জয়যুক্ত হয়ে থাকে।

কত দুঃখের ভিতর দিয়ে হযরত মোহাম্মদ (দ.) হযরত ঈসার (আ.) ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। মানবসমাজের যখন অধঃপতন হয়, তখন শুধু ধর্মবিশ্বাস তাদিগকে বড় করে রাখতে পারে না। হযরত ঈসার (আ.) মহাধর্ম যখন বিলুপ্ত হয়েছিল, তখনই আরব-মরুভূমির মাঝে এক নূতন মহাপুরুষ মানুষের জন্য কল্যাণমন্ত্র নিয়ে দাঁড়ালেন।

যে কঠিন কথা বলতে পারে, সে নিজকে কত ছোট করে ফেলে! যে নীরবে অপমান সহ্য করে শত্রুর মঙ্গল চায়—সে কত মহৎ। যিনি মহৎ তিনি অপমানের বিরুদ্ধে সহজে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন না—তিনি অপেক্ষা করেন। আল্লার কাছে তিনি শত্রুর সুবুদ্ধির প্রার্থনা করেন। তিনি কাতরভাবে বলেন—হে খোদা, এরা কিছু বোঝে না, এদিগকে ক্ষমা কর।

জাতীয় অপমান সহ্য করা মহত্ত্বের লক্ষণ নয়, বরং তা কাপুরুষতা! প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা সত্ত্বেও যদি প্রতিশোধ না নিই, সেখানেই চরিত্র মাহাত্ম্যের পরিচয় দেওয়া হয়।

অপদার্থ ব্যক্তির অন্যায় ক্রোধের কথা শুনে চুপ করে থাকায় বিপুল মহত্ত্ব আছে! অন্যায় বা অপমানের কথা শুনে মনকে শান্ত করে রাখা সহজ কথা নয়। ক্রোধ যদি সংযত করতে পার, লোকে জানুক বা না-জানুক মহত্ত্বের পরিচয় নিয়ে যদি তুমি প্রাণে তৃপ্তি লাভ করতে পার তাহলে তোমার ভিতরে একটা দুর্জয় শক্তি জেগে উঠবে। ভিতরকার শক্তিই আমাদিগকে বড় করে তোলে—এ শক্তি লাভ হয় জ্ঞান, চরিত্রবল আর পুণ্যকার্যে।

বড় মরণে যদি জীবনের বালাই হতে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তা কত সুখের হয়! এ জগতে কামনা-বাসনার কোনো তৃপ্তি নাই। অনন্ত ক্ষুধা মানুষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। দুঃখ-পাপের কঠিন চাপে মানুষের হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এ জগতে কিসের সুখ? গত জীবনে যত সুখ ভোগ করেছি, তার একটুও তো মনে নেই—সে কেবল একটা বিরাট স্বপ্ন, আর কিছু নয়।

যতকাল বেঁচে আছি ততকাল যেন কোনো অন্যায় না করি, জীবনে যে মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেব সেই স্মৃতিটুকু মৃত্যুকালে আমার প্রাণে যথার্থ আনন্দ আনবে। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ পাপ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, যথাসাধ্য মানুষের দুঃখ-কষ্ট মোচন করতে চেষ্টা করব। তারপর মৃত্যুর দ্বারা আমাদের মুক্তি হবে। এ জগতে অনন্ত কোটি মানুষ এসেছিল, কোথায় তারা? কত যুবক-যুবতী এ জগতে কত হাসি হেসেছে—কোথায় সেসব হাসি? কেন মিছে এই স্বপ্নভঙ্গের জন্য এত মারামারি!

অভাব ও দারিদ্র্য মানুষের মনুষ্যত্বকে চূর্ণ করে দেয়, কী মহত্ত্বের পরিচয় সে দেবে? প্রাণ দিয়েই যে সবসময় মানুষের কল্যাণ করতে হবে, এমন কথা হতে পারে না। দুঃখী দরিদ্রকে অর্থ দিতে হবে, দরিদ্রের জন্য ভিখারি হতে হবে। কিন্তু যার কিছু নাই, সে তো পূর্বেই ভিখারি হয়ে

আছে, সে আর কী দিয়ে ভিখারি হবে? অর্থ উপার্জন কর মানুষের জন্য, এরই নাম মহত্ত্ব! নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে প্রেম, আর হাতে অর্থ মানুষকে মহৎ করে। জীবনে অর্থ সঞ্চয় করতে হবে পরের জন্য। পরের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করে, পরের জন্য যিনি দরিদ্র জীবনযাপন করেন, মানবমঙ্গলে অর্থ ব্যয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহৎ।

ব্রহ্মদেশে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এক ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকার চাল দুঃস্থ মানুষের মাঝে বিতরণ করেছিলেন। দরিদ্রের পক্ষে মানুষের এত কল্যাণ করা কি সম্ভব?

মহৎ যিনি, তিনি বড়। ক্ষমতা আছে, কিন্তু যে-ক্ষমতার নিত্যই অপব্যবহার হয়; অর্থ আছে কিন্তু যে-অর্থ কেবল জমিদারি ক্রয় করাতেই শেষ হয়ে যায়; এরূপ ক্ষমতা ও অর্থের মালিককে বড় বলা যায় না। যারা তার কাছে লাভের আশা করে, যারা তার আত্মীয়, তারাই তার তোষামোদ ও প্রশংসা করে। জ্ঞানী ও সত্যের সেবক যাঁরা, তাঁরা এদিগকে সম্মান করেন না।

ইচ্ছা করলে ধনীরা জীবনে কত মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন। মানুষের লক্ষ মণ অর্থ থাকলেও যদি সে জ্ঞান-দরিদ্র হয়, সে বোঝে না মানব-আত্মার তৃপ্তি কোথায়; সে বোঝে না প্রকৃত ধর্মপালন কিসে হয়? প্রেমহীন মায়াহীন নিষ্ঠুর প্রাণের উপাসনার-যে কোনো মূল্য নেই—এ-কথাও সে জানে না। সে পীড়িত নরনারীর বুকের উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি ওজু করে মিলাদ ও ধর্মসভায় যোগ দেয়।

আমেরিকার কাছ দিয়ে সমুদ্রপথে একখানি যাত্রী-জাহাজে এক ইংরাজ-দম্পতি যাচ্ছিল। সঙ্গে তাঁদের কয়েকটি ছেলেমেয়ে। বড়মেয়েটির বয়স আঠারো বৎসর হবে। তার নামটি আমার ঠিক মনে নাই। হঠাৎ জাহাজের কাপ্তানের কানে দূরের একখানি জাহাজের বিপদসঙ্কেতের ধ্বনি এসে লাগল। কাপ্তান দূরবীন দিয়ে দেখলেন, বহুদূরে একখানি জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাবিকদিগকে তিনি সেদিকে জাহাজ চালাতে হুকুম দিলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে বিপন্ন জাহাজের নিকটবর্তী হয়ে দেখা গেল, জাহাজখানি জনমানবশূন্য। মাত্র ২/৩ জন লোক বিষণ্নমনে ডেকের একধারে মলিনমুখে বসে আছে। নূতন জাহাজখানি বিপন্ন জাহাজের পাশে লাগাতেই তারা উঠে এল, সমস্ত যাত্রীরা তাদের কী বিপদ জানবার জন্যে সমুৎসুক হয়ে জাহাজের একপাশে এসে দাঁড়ালেন।

কাপ্তানের প্রশ্নের উত্তরে তারা বললে, ভীষণ কালাজ্বরে সবাই মারা গিয়েছে; যারা এখনো মরে নাই তারাও মরার মতো হয়ে কেবিনের মাঝে পড়ে আছে। কেউ তাদের দেখবার নাই। আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী ভালো আছি।

কালাজ্বরের কথা শুনে যাত্রীদের ভিতর একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল, কারণ এই জ্বর ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে—এ জ্বর হলে রোগী মরবেই!

কাপ্তেন গম্ভীরভাবে যাত্রীদিগকে লক্ষ করে বললেন—যাত্রীদের মাঝে এমন কি কেউ নেই, যিনি এই বিপন্ন লোকগুলিকে সাহায্য করবার জন্য যেতে পারেন! এ-কথাও বলছি, যিনি এদের মাঝে যাবেন, তাঁর প্রাণের আশা খুব কম। মরবার পণ করেই এদের মাঝে যেতে হবে।

কেউ কথা বলছিল না। কাপ্তান আবার বললেন—এখানে যাত্রীদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তবুও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবার মতো কি কেউ নেই?

একটি মেয়ে বললে—আমি এদের মাঝে যাব। সবার মুখ প্রশংসা ও শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যে ইংরাজ দম্পতির কথা বলছিলাম, এই মেয়েটি তাঁদেরই।

মহৎপ্রাণ যুবতীটির মা কেঁদে বললেন—মা, তুমি প্রাণ দেবার জন্য এদের মাঝে যাবে? তুমি মরো না, বেঁচে থাকো। আমার মরবার সময় হয়েছে, আমি এদের মাঝে যাব।

মেয়ে বললে—না মা, সে কি হয়? দেখ, আমি এখনো অবিবাহিতা, আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই। আমার মৃত্যুতে জগতে বিশেষ কিছু আসবে-যাবে না। তুমি গেলে তোমার এ ছোট শিশুগুলির যত্ন করবে কে?

মেয়েটির পিতা অশ্রুসিক্ত চোখে বললেন—মা, আমি বুড়ো হয়েছি, আমার জীবনের মূল্য খুব কম! তোমরা বাড়ি যাও, আমিই বিপন্নদের সেবা করতে যাব।

কন্যা বললে—বাবা, তুমি গেলে আমার ভাইবোনগুলি আর কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে? আর তুমি পুরুষ—তোমার কি সেবাশুশ্রূষা করা সাজে? দয়া করে আমাকে অনুমতি দাও। সেবাদ্বারা জীবনকে ধন্য করবার সুযোগ আমাকে দাও। এরচেয়ে জীবনকে সুব্যবহার সবসময়ে ঘটে না।

সময় সংক্ষিপ্ত। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করবার সময় ছিল না। পিতা স্নেহে কন্যার ললাট চুম্বন করলেন। মা কন্যাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সজলনয়নে বললেন—মা, ধন্য তোমার জীবন, তোমাকে পেটে ধরে আমিও আজ ধন্য হলেম।

জাহাজের যাত্রীরা সবাই এসে বালিকাটির সঙ্গে করমর্দন করলেন। ছোট ভাইবোনগুলিকে একবার কোলে করে এই মহাপ্রাণা বালিকা বিপন্ন যাত্রীদের জাহাজে নেমে গেলেন।

অনেক সময় দরিদ্রের মাঝে মহত্ত্বের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়, শিক্ষিত ও বড়লোকদের মাঝেও তা পাওয়া যায় না। দরিদ্র সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব, সহৃদয়তা ও ছোট ছোট দানের নিকট জগৎ বহুপরিমাণ ঋণী। কয়েকটি হাসপাতাল বা অতিথিশালা মানুষের দুঃখের বহুপরিমাণ মীমাংসা করলেও পল্লির সহৃদয় দীন-দুঃখী মানুষ নীরবে দেশের বহু নিঃসহায় নরনারীর দুঃখমোচন করে।

পরের অর্থ অপহরণ করে লোক বড়মানুষ হয়েছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। কিন্তু পরকে মানুষ কেমন করে একেবারে নির্লোভ হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে, তার গোটা-দুই দৃষ্টান্ত আমি এখানে দেব। এইসব মানুষ জড়দেহের ভোগ অপেক্ষা আত্মার সাত্ত্বিক তৃপ্তির ভিখারি। মানব-সংসারে এই ভাবের মানুষের আবির্ভাব বেঁচে থাকে। ভণ্ড নরপিশাচেরা এ জগতের কেবলই অকল্যাণ করে, আর মহাপ্রাণ জাতিরা জগতের কল্যাণ, সুখ ও আনন্দ বর্ধন করেন।

কলিকাতা মদনমোহন দত্তের বাড়ির ঝি-এর ছেলে রামদুলাল, দত্তের বাড়িতে সরকারের কাজ করত। এই যুবক একসময় প্রভুর টাকায় একলক্ষ টাকা লাভ করে। রামদুলাল ইচ্ছা করলে এই টাকা নিজে নিতে পারত, তাতে তার বিশেষ অন্যায় হত না। প্রভুর টাকা প্রভুকে ফিরিয়ে দিয়ে লাভের টাকা নিজে নিলে প্রভু কিছুই জানতে পারতেন না। রামদুলালের ভিতর যে আশ্চর্য মহত্ত্বের গৌরব ঘুমিয়ে ছিল, তা তাকে বলেছিল—দুলাল, এই টাকা তুমি তোমার প্রভুকে দিয়ে দাও। জীবনের মহত্ত্বের কাছে এই লক্ষটাকার মূল্য খুবই কম। দুলাল প্রভুর সামনে যখন লক্ষটাকা রেখে দিয়ে বললে-মহাশয়, আপনাকে না জানিয়ে আপনার টাকা খাটিয়ে লাভ করেছি, এর ওপর আমার কোনো অধিকার নেই, দয়া করে গ্রহণ করলে সুখী হব।

মদনমোহন বিস্মিত হয়ে বললেন—দুলাল, তোমার মধ্যে এত মহত্ত্ব, এত মনুষ্যত্ব ছিল তা তো কখনো বুঝি নি! মানুষ এক পয়সার জন্য কতখানি নীচতার পরিচয় দেয়, আর তুমি

একলক্ষ টাকা কী করে আমাকে দিচ্ছ? আমি তো এর কিছুই জানিনে। তুমি মানুষ না দেবতা! এ টাকা আমাকে দিতে হবে না। এ টাকা তোমারই, এর ওপরে আমার কোনো অধিকার নাই!

প্রভুর আদেশে টাকা দিয়ে রামদুলাল ব্যবসা আরম্ভ করেন। উত্তরকালে তিনি বিখ্যাত ধনবান হয়েছেন। দুঃস্থ নরনারীকে তিনি অনেক সময় গোপনে টাকা পাঠাতেন। কে যে কোথা থেকে টাকা পাঠিয়েছে, কিছুই তারা জানতে পারত না। মাদরাজ দুর্ভিক্ষে তিনি লক্ষটাকা দান করেন। কলিকাতা হিন্দু-কলেজ স্থাপনের জন্য তিনি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

এইবার এক মুসলমান যুবকের মাহাত্ম্য বলব—যা শুনলে আপনারা মনে করবেন এও কি সম্ভব!

বড়বাজারে এক তাঁতির একখানা দোকান ছিল। একদিন দোকানে বেচাকেনা করবার সময় একটা জরুরি কাজে করিম বখ্‌শ বলে এক ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রেখে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে গেলেন। করিম বখ্‌শ একঘণ্টা দোকানে বসে থাকল, কিন্তু তবুও দোকানদার ফিরে এল না। এদিকে ক্রেতারা জিনিসপত্রের জন্য তাগাদা করতে লাগল। করিম বখ্‌শের জিনিসপত্রের দাম জানা ছিল, সে কয়েকখানা কাপড় বিক্রি করলে। দুঃখের বিষয়, সারাদিন চলে গেল তবুও দোকানদার ফিরে এল না। করিম অগত্যা সেদিন আর বাড়ি যেতে পারল না, দোকানদারের অপেক্ষায় সেখানেই রাত্রিযাপন করল। পরের দিন যথাসময়ে দোকান খুলে করিম, মালিকের অপেক্ষা করতে লাগল—কিন্তু মালিকের আর সন্ধান নাই। করিম অগত্যা নিজেই বেচাকেনা করতে লাগল। এইভাবে ২/৩ দিন শেষে একমাস কেটে গেল, তাঁতি ফিরল না। করিম দোকানের ভার ফেলে যাওয়া অধর্ম মনে করে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ চালাতে লাগল। তাঁতি যাদের কাছে ঋণী ছিল, করিম তাদের সব টাকা পরিশোধ করল। তাঁতির হয়েই সে নূতন কাপড়ের চালান এনে দোকানের আয় ঠিক রাখল। এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। করিমের আন্তরিক চেষ্টায় দোকানের ক্রমেই উন্নতি হচ্ছিল, শেষে এক দোকানের পরিবর্তে তিনটি দোকান স্থাপিত হল। করিম সব দোকানই তাঁতির নামে চালাতে লাগল।

লোকে ভাবল, করিম তাঁতির দোকান কিনে নিয়েছে। করিমের সম্মান-প্রতিপত্তি ইত্যবসরে সব বেড়ে গেল, সে মস্ত সওদাগর হয়ে বিরাট কারবার চালাতে লাগল।

প্রায় সাতবছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। একদিন করিম দোকানের গদিতে বসে আছে, এমন সময় দেখল একটা বুড়ো লাঠি ভর করে তারই দোকানের সামনে করিম বলে একটা বালকের খোঁজ করছে। বুড়োর পরনে একখানা ময়লা কাপড়, রোগা চেহারা। শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। তাকে পথের ভিক্ষুক বলে মনে হচ্ছিল। করিম দৌড়ে এসে বুড়োকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে বললে—আমি হচ্ছি সেই করিম, এই সাতবছর আমি আপনার দোকান পাহারা দিচ্ছি—দয়া করে এখন আপনি আপনার দোকানের ভার নিন, আমি বিদায় হই।

বৃদ্ধ করিমের মহৎপ্রাণের পরিচয় পেয়ে দুইচোখ দিয়ে পানি ছেড়ে দিলেন। বললেন—করিম, আমার আর কিছু দরকার নেই, এসবই তোর! আমার এ সংসারে যারা আপন ছিল, সবাই ছেড়ে গেছে, এখন তুই আমার আপন। সেই সাতবছর আগের কথা, এখান হতে বেরিয়ে পথে সংবাদ পেলাম আমার পত্নীর সাংঘাতিক পীড়া, কালবিলম্ব না করে আমাকে বাড়ি যেতে হয়েছিল। যেয়ে দেখলাম পত্নীর মৃত্যু। কয়েকদিন পরে ছেলেদুটিও মারা গেল। তারপর নানা দুর্বিপাকে আমি পড়ি। কিছুতেই বাড়ি ত্যাগ করতে পারলাম না। তারপর এই দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এখন আমার কেউ নেই; আত্মীয়স্বজন, অর্থ, দেহের বল সব হারিয়ে

এখন আমি পথের ফকির হয়েছি। অতিদুঃখে অনেক আশা-নিরাশায় মনে হল কলিকাতায় যেয়ে একবার করিমের সন্ধান করি, তাকে যদি পাই তার কাছ থেকে ২/১ টাকা ভিক্ষা নেব। দোকান কি আর এতদিন আছে? করিম, আমি যে তোকে এমন রাজার হালে দেখব, এ কখনো মনে করি নি। আর তুই যে কী এমন করে আমার কাছে পরিচয় দিলি, এ ভেবে আমার মনে যে আনন্দ হচ্ছে, তা আর কী বলব। বল্ বাবা, তুই মানুষ না ফেরেস্তা!

করিম সবিস্ময়ে বলল—আপনি পিতার মতো, আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। সে বিশ্বাসকে আমি রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার পক্ষে ঢের। এর বেশি আমি কিছু আশা করি নে।

তাঁতি করিমের হাত থেকে দোকানের ভার গ্রহণ কললেন না। জীবনে তাঁর আর কোনো বন্ধন রইল না। একটা মাসিক বন্দোবস্ত করে তিনি অতঃপর তীর্থে চলে গেলেন।

মানুষের জীবন এত সুন্দর, এত পবিত্র হয়, তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। এই পাপময় মানবসমাজে মহৎপ্রাণ মানুষ আছে, মানুষ এদের নাম জানুক আর না জানুক এরা যে জগৎকে ধন্য করে দিয়েছেন, সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

জীবনের প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়—মহত্ত্বের ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়ে। যে জীবন পবিত্রতা, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আনন্দ হতে বঞ্চিত থেকে গেল, বৃথাই সে জীবন! এই উদার আকাশতলে এই আলোগন্ধ-ভরা পৃথিবীর বুকে একবার পাপ, নীচতা ও অন্যায় হতে ফিরে দাঁড়াও—জীবনকে মহৎ ও গরীয়ান করে তোল।

শত্রুকে আঘাত দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু তার জন্যে অশ্রুপাত করা বড় কঠিন। পরাজয়ের পর হিমু (হেমচন্দ্র) বন্দি হয়ে আকবরের সম্মুখে নীত হলেন, তখন তরবারি হাতে করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বৈরামকে তিনি বললেন—ওস্তাদ সাহেব, এই দুর্বল রোগজীর্ণ বন্দিকে হত্যা না করে কি ক্ষমা করা যায় না?

আকবরের প্রাণের মহত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা বৈরামের ছিল না। তিনি দুর্বল শত্রুর মাথা নিজহস্তে ছেদন করেছিলেন। বৈরামের শক্তিশৌর্য দেখে মানুষ তখন ভীতশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল—সে আজ কতদিনের কথা। মানুষ সে গরিমার কথা ভুলে গিয়েছে, কিন্তু মানুষ এখনো বালক আকবরের অশ্রু সম্ভ্রমের সঙ্গে মনে করে রেখেছে।

মহাপুরুষ ডাক্তার বার্নাডো সারাজীবন গৃহহারা পথের বালকবালিকাকে কুড়িয়ে বেড়িয়েছেন। মানুষ যাদের কথা ভাবে নি, বার্নাডো তাদের জন্য অশ্রু ফেলেছেন। এ জগতে এক-একটা মানুষ কত মহৎ, কত বিরাট প্রাণ নিয়ে আসেন। তাদের নয়নে শুধু অশ্রু ঝরে, হৃদয়ে অনন্ত প্রেম বয়। মহত্ত্ব ও পুণ্যের প্রতিচ্ছবি—তাঁরা যে-পথ দিয়ে যান, সে-পথে ধূলিকণাগুলিও পবিত্র হয়ে ওঠে। তাঁরা নিজের জন্য বেঁচে থাকেন না।

সবসময়ই কি ঐশ্বর্য ও সুন্দরী পত্নীর জন্য লালায়িত থাকবে? ত্যাগ ও প্রাণের পূজা করতে কি তোমরা শিখবে না? দরিদ্রের করুণ মুখ, নিঃসহায় নরনারীর দীর্ঘশ্বাসকে সম্মান জানাতে তোমাদের মন কবে আনন্দবোধ করবে? উচ্চ অট্টালিকার আলোক-উজ্জ্বল কক্ষ, সাহানা-মল্লার মুখরিত ধনীর মর্মরসৌধ অপেক্ষা দরিদ্রের পর্ণকুটির ও সন্ধ্যার অন্ধকারসমাচ্ছন্ন বকুলগাছের সবুজ পাতা ভরা উঠানটিকে কবে বেশি শ্রদ্ধা করতে শিখবে? দেবতার জন্য সবাই পথ সাজিয়ে রেখেছ, পাপীর জন্য কবে তুমি ক্ষমতা আর স্নেহ ছড়িয়ে দেবে? মধুর কথা শুনে, সদ্ব্যবহার পেয়ে তোমার মন পুলকে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে—নিষ্ঠুর কথা আর মানুষের সদ্ব্যবহার পেয়েও কবে তুমি নির্বিকার ও শান্ত হয়ে থাকতে শিখবে?

কাজ

জীবনে মানুষকে কাজ করতেই হবে, কারণ কাজের মধ্যেই মানবজীবনের সুখ ও কল্যাণ নিহিত। মানবসমাজের সুখ ও কল্যাণ বর্ধন ছাড়া জীবনে আর কিসে আনন্দ পাওয়া যায়? মানবসমাজের কথা বাদ দিয়ে যদি নিজের সুখের কথাও চিন্তা করা যায়, তাহলেও আমাদিগকে কাজ করতেই হবে। মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে জগতে কোনো সম্পদ লাভ হয় না।

সাধনা ও পরিশ্রমের সঙ্গে যদি জ্ঞানের যোগ থাকে, তবে লাভ হয় খুব বেশি। মূর্খ শত পরিশ্রম করে যা না করতে পারে, জ্ঞানী অল্প পরিশ্রম করেই তা করতে পারেন। বড় বড় কলকারখানা, রেলওয়ে, স্টিমার, তড়িতের অপূর্ব শক্তিরহস্য জ্ঞানীর মাথা হতেই বের হয়েছে।

আলস্য করেই জাতি ধ্বংসের পথ তৈরি করে। মানুষকে দোষ দিয়ে কী লাভ? কেউ আমাদিগকে ছোট করে না, নিজের পতনের পথ আমরা নিজেই তৈরি করে নিই।

এ জগতের শুধু মুটে-মজুরেরাই পরিশ্রম করবে—এ হতে পারে না। দৈনিক আহার সংস্থানের জন্য তাদেরকে পরিশ্রম করা দরকার হয় বটে, কিন্তু বড় যারা তাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে। পয়সাকড়ির অভাব নাই, নিজের অর্জিত ধনসম্পত্তিতে দিন বেশ চলে যাচ্ছে, সুতরাং কোনো কাজ করবার দরকার নেই—এমন কথা বলবার তোমার কোনো অধিকার নাই। এই যে ধনসম্পত্তি, যা তুমি ভোগ করছ, এগুলি সংগ্রহ করতে তোমার পিতাকে কতখানি পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তা কি তুমি একটুও ভাবো না? রাজা হও, নবাব হও, নিজের জন্য না হোক, তোমার পাড়াপ্রতিবেশীর জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। কাজ না করে, এই দীর্ঘজীবনটাকে কী করে কাটিয়ে দেওয়া যায়? আলাপ, রহস্য, হাসিঠাট্টা, খেলাধুলায় অনুরক্ত ব্যক্তিরা অফুরন্ত আনন্দ লাভ করতে পারে, কিন্তু তুমি কেমন করে এইসব লক্ষ্যহীন তরুলতার মধ্যে তোমার মহিমান্বিত জীবনকে ডুবিয়ে রাখতে পার? তোমার কাজ আছে। বড়লোকদের সঙ্গে দেখা করে, হেসে, গান করে তুমি তোমার জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পার না।

এ জগতে যারা বড় হয়েছেন, যাদের নাম করে মানুষ ধন্য হয়, যারা জগৎ সংসারকে বহু কল্যাণ সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন—তারা জীবনে অনবরত কাজ করেছেন। অলসের উপাসনার কোনো মূল্য নাই। কাজের মধ্যে কি এবাদত নাই? শুধু আল্লা-আল্লা করে খোদাকে তৃপ্ত করা যায় না—এ তুমি বিশ্বাস কর।

দুঃখী নরনারীর জন্য পরিশ্রম করা কি এবাদত নয়? বিপন্ন মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করা কি এবাদত নয়? আল্লার জন্য পয়সা উপায় কি এবাদত নয়?

জগতের যে-সমস্ত সুবিধা আমরা ভোগ করছি, এর মূলে কত মানুষের সাধনা বর্তমান—হয়ত কেউ তাদের নামও জানে না। যুদ্ধক্ষেত্রে যে-সমস্ত মানুষ প্রাণ দিয়ে জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করে, তাদের কয়জনের নাম মানুষের মনে আছে?

আলস্যে মানুষের এবং জাতির সর্বনাশ হয়, মানুষের সুখ ও জাতির কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত হয়। কতকগুলি মানুষ আয়াস-আরামে জীবন কাটাতে পারে; কিন্তু এই আয়াস-আরামের উপকরণ জোগাবার জন্যে বহু মানুষ প্রাণপণ পরিশ্রম করছে। জাতির স্বাধীনতা ও শক্তি বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সভ্যজাতির মধ্যে কী বিপুল বিরাট সাধনা চলতে থাকে! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন জাতির বিরাট পেট কী করে ভরবে, এ-সম্বন্ধে যারা মোটেও চিন্তা করে না, তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যারা অভাগা মূর্খ, তারা এ-সমস্ত কথার কিছুই বোঝে না। তাই তারা হাসি-উল্লাসে জীবন কাটিয়ে দেয়। নিজেদের উদ্যত সাধনা ব্যতীত খোদা কখনো মানুষকে বড় করেন না। মানুষের অভাব বেদনা মানুষকে মীমাংসা করতে হবে!

যাদের মধ্যে চরিত্রবলের খুব অভাব, যারা পরের ধন অপহরণ করে বাঁচতে চেষ্টা করে, তাদের পরিশ্রম করবার কোনো দরকার নাই। মানুষকে সত্যপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হলে, তার অক্লান্ত পরিশ্রম আর কঠিন সংযম চাই। মান-অপমানের জ্ঞান ভুলে যেতে হবে; ভেবে নিতে হবে চুরি করলে, পরমুখাপেক্ষী হয়ে অলস জীবনযাপন করলে জীবনের অপমান হয়। সত্যপথে থেকে যে-কোনো কাজ কর, তোমার দুঃখের মীমাংসা হবে। মানুষ তোমাকে ছোট কাজ করতে দেখে নাক সিটকাতে পারে; কিন্তু যে নাক সিটকায়, দুর্দিনে তার কাছে একটা পয়সা চেয়ো, দেখবে সে কেমন করে তোমার কাছ থেকে সরে পড়ে। উপরে খোদা আর নিচে তুমি। মানুষের চেয়ে খোদার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ বেশি। কত মানুষ এ জগতে এসেছিল—কোথায় তারা? খোদা চিরকাল আছেন—তোমাদের জীবনের হিসাব তারই সঙ্গে হবে। যে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী, সে তোমাকে ঘৃণা করে মানুষের চোখমুখে উপহাসের হিল্লোল তুলেছে—সে কয়দিন বাঁচবে? মানুষের উপহাসকে ভয় করে অন্যায় করে জীবনকে বড় করে তুলবার কোনো দরকার নেই, মানুষ তোমাকে সম্মান করে বড় আসন দিক আর না-দিক, কোনো ক্ষতি নেই—দাম্ভিক ধনবান মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোমার খুব অল্প। এরূপ মানুষের কাছ থেকে তুমি ফিরে এসো। যা উচিত সেই পথ অনুসরণ করলে শতরকমে জীবনকে বড় করে তোলা যায়। ফরসা কাপড় পরে ভদ্রলোকের কাছে সম্মান বজায় রাখবার জন্য নিজের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে ফেলো না। সে তোমাকে অপমান করে তৃপ্তিলাভ করেছে, বিশ্বাস কর, তারচেয়ে সুখের জীবন তোমার। তুমি অন্যায় কর না, তোমার জীবনে কোনো পাপ নাই, তোমার ছেলেগুলি অন্যায়ের পয়সায় বেঁচে নাই, সতীসাধ্বী পত্নী তোমার ঘরে—তুমি তো রাজা!

জীবনের অপমান হয় দুটি জিনিসে—প্রথমত অজ্ঞতায়, দ্বিতীয়ত পরনির্ভরশীলতায়। অজ্ঞতার ন্যায় মহাশত্রু মানবজীবনে আর নাই। জীবনে যে অবস্থাতেই থাকো না, তোমাকে জ্ঞানের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। জ্ঞানের চরম সার্থকতা—মানুষকে ভালোমন্দ বলে দেওয়া তার আত্মার দৃষ্টি খুলে দেওয়া, তার জীবনে কলঙ্ক-কালিমাগুলি ধুয়ে ফেলা। অর্থ আছে বলে বা কাজের অজুহাতে যাদের জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তারা অজ্ঞাতসারে নিজদিগকে পতিত করে। দাম্ভিকতা ও অর্থের প্রভাব তাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে দেয়।

দরিদ্রতম-দরিদ্র অপেক্ষা যে হতভাগ্যের অলস কর্মহীন জীবন অন্যের ওপর নির্ভর করে, তার অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। এতে মনুষ্যত্বকে একেবারে চূর্ণ করে ফেলা হয়। জীবনে সকলের চেয়ে উচ্চলক্ষ্য হবে—তোমাকে জীবনে যেন পরের দয়ার ওপর নির্ভর না করতে হয়, কোনো সময়ে যেন মানুষের সামনে তোমার মন সঙ্কুচিত না হয়ে ওঠে। তোমার মাঝে যে বিবেকবুদ্ধি আছে, তাকেই যেন তোমাকে ভয় করতে হয়।

কোনো ছোট কাজ করেও যদি জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায় তাও ভালো। কর্মহীন দীন জীবন কত দুঃখের, তার মুখখানি কত করুণ! বৃথা তার জীবন, বৃথা তার মানবসমাজে বাস। মানবজীবনে এই দারুণ অপমান হতে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়েরই যেন জীবনের চরম লক্ষ্য হয় এই। যে ন্যায় ও সত্যের অপমান করে, মানুষকে ভয় করে, তার উপাসনার কোনো মূল্য হয় না। যে মানুষের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রয় করছে, তার আত্মায় খোদার আসন হবে না। আত্মার ওপর আল্লা ও ন্যায় সত্য ছাড়া আর কারো প্রভাব যেন না পড়তে পারে।

যে-কোনো হীন ব্যবসা করা ভালো, তবু বাইরে চাকচিক্য বজায় রাখবার জন্য অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা ঠিক নয়। তোমার পত্নীর পরনে ভালো শাড়ি, তার গায়ে সোনার গহনা দেখে নরনারী প্রশংসাপূর্ণ বিনীতদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকবে—তোমার ভালো ঘোড়াটি দেখে, তোমার দাসদাসী ও খানসামা পেয়াদা দেখে হয়তো তোমার মন অহঙ্কারে ভরে উঠবে—তোমার অসত্য জীবনের, তোমার দীন হৃদয়ের খবর তোমার পত্নীর কাছে হয়তো ঢাকা আছে; মানুষও তা জানে না। কিন্তু তুমি তো জানো? তোমার মনুষ্যত্বের কাছে তো এ কেলেঙ্কারি অবিদিত নেই। মানুষের এই প্রশংসার দৃষ্টি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান কর, তোমার এই অনুভূতি একেবারে চূর্ণ করে দাও।

আত্মাকে অবনমিত করে কে কুকুরের মতো দেহটিকে বাঁচাতে চায়? আত্মাকে পতিত করে ধর্মজীবনকে ঠিক রাখা যায় না—এ যদি মানুষ না বোঝে, তবে সে কী প্রকার মানুষ? কোন্ ধর্মের লোক সে? কোন্ মহাপুরুষের দীক্ষা সে লাভ করেছে, অর্থ ও রুটির জন্য দীন ভিক্ষুক হয়ে মানুষকে সালাম করতে হবে—এরচেয়ে বড় লজ্জা, বড় অপমান জীবনে আর কী আছে?

আমি মানুষ, এ জগতে আমার বাঁচার অধিকার আছে। তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে সম্মান কর, নাহয় করো না—ও আমি ভিক্ষা করে নিতে ইচ্ছুক নই। আমি কারো মনে অন্যায় করে আঘাত দিতে চাইনে। আমি দীনাতিদীন, তাই বলে মানুষের পদলেহন করা আমার কাজ নয়—যা সত্য বলে বুঝি, তাই আমি করব—মানুষের সত্য গ্রহণের জন্য আমার আত্মা সর্বদা উন্মুখ। আমি যা বুঝি তাই অভ্রান্ত সত্য এ-কথা আমি বলি না। আত্মা আমার স্নেহ-করুণায় ভরা, আমি প্রতিবেশীর ক্ষতি করি না। আমার নয়নে জল আসে, আমার কথা ও কাজের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য নাই। আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে কথা বলি পাছে আমার কথায় কোনো অশুভ হয় এই ভেবে; দেশকে ভালোবাসি বলে সময়াভাবে নিরন্ন প্রতিবেশী ও দীনদরিদ্রের কথা আমি ভুলি না, জাতির স্বাধীনতা চাই বলে দুর্বলকে আমি রূঢ় কথা বলি না; আমার বেশি বুদ্ধি আছে বলে আমি আমার বোকা প্রতিবেশীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করি না; আমি কখনো মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করি না, ঋণ পরিশোধ করতে আমি ইতস্তত করি না—আমি স্বাধীনচিত্ত কৃষক, আমি নিজের হাতে লাঙল চষি, জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে আমার যোগ আছে—জিজ্ঞাসা করি কে আমাকে ছোট বলে?

ডেপুটি সাহেব, দারোগাবাবু, উকিলবাবু, আমাকে সম্মান করে না—তাতে আমার কিছু আসে যায় না। পল্লির অজ্ঞাত দুঃখিনী বিধবা আমার নাম করে চোখের জল ফেলে, সর্বস্বহারা নিঃসহায় দরিদ্র বুড়ো ডেকে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করে, তরুণ যুবকটি আমার স্নেহ নেবার জন্য আমার কাছে আসে—ঐ আমার ঢের। আমি কারো কাছে কোনো সম্মান চাই না, কোনো বড় আত্মীয় আমার নেই, চেয়ারে বসি না; যাদের পেট ভরা আছে তাদিগকে খাইয়ে আমি নাম

ক্রয় করি না, আমার পত্নীর গায়ে বহু গয়না নেই, আমার ছেলেরা চাকরের সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে না।

কাজ করলে অসম্মান হয় না—অসম্মান হয় মূর্খ হয়ে থাকায়, পাপ জীবনে, আত্মার সংকীর্ণতায়। জীবনকে কলঙ্কিত করে লোকের সঙ্গে উঁচুমুখ করে কথা বলতে কি লজ্জা হয় না? তস্করকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে তোমার ঘৃণা বোধ করে না?

কাজ করাতে কোনো লজ্জাই নেই। পবিত্র সন্তুষ্ট মন নিয়ে পরিশ্রম কর, তোমার জীবনে সোনা ফলবে। হৃদয়ে আশা পোষণ করে কাজ করাতে কত আনন্দ পাওয়া যায়! দিনের-পর-দিন ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা মানুষ কেমন করে কাজ করে। যুবক বয়সে নিষ্কর্মা জীবনযাপন করাই বিপজ্জনক! মেয়েদের পক্ষে আরো বিপজ্জনক। কাজ নেই কর্ম নেই—অনবরত শুয়ে-বসে থাকলে মাথায় হাজার তরল চিন্তা আসে। জীবনে তরল চিন্তার ধাক্কা সামলানো বড় কঠিন। যার মাথায় একবার তরল চিন্তা ঢুকেছে, তার আর রক্ষা নেই—তার অধঃপতন হবেই।

টাকাপয়সার অপব্যবহার করলে লোকে অমিতব্যয়ী লক্ষ্মীছাড়া বলে, সময়ের অপব্যবহার যে করে সেও অমিতব্যয়ী। সময়ের সদ্ব্যবহার কর—সময়ের আর এক নাম সম্পদ। লেখাপড়া শিখে চাকরি করা ছাড়া কি জীবনের আর কোনো ব্যবহার নাই? কামারের লোহার কাজ, টুপি তৈরি, পুস্তক বাঁধাই, কল-কারখানার কাজ, কাপড় তৈরি ও কাঠের কাজ, খেলনা তৈরি, লণ্ঠন ও ছড়ি তৈরি প্রভৃতি বহু শিল্প তুমি শিখতে পার।

শিল্প জাতির গৌরব—শিল্প দেশকে সৌন্দর্য ও সম্পদে পূর্ণ করে—ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলি তার প্রমাণ। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে মাটি হতে সোনা ফলানো যায়। মাটির ফসল হতেই যদি জীবনের অভাব পূরণ হল, তাহলে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যার ভার হতে তুমি মুক্তি হলে! বিদেশী বিলাসদ্রব্য কিনে, নিত্যনতুন অভাব সৃষ্টি করে জীবনের দৈন্য না বাড়িয়ে, নির্বিবাদে পল্লির নির্জনপ্রান্তে বসে জীবনের শত রহস্যের সন্ধানে জীবনকে ব্যাপৃত রাখো, বিশ্বের চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলীর লেখা পাঠ কর, নূতন নূতন কলকারখানা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ কর, বিজ্ঞান আলোচনা কর—তোমার চিন্তা, তোমার জ্ঞান জাতিকে দান কর।

তোমার চারিদিকে যে-সমস্ত জাতি বড় আসনে উপবিষ্ট রয়েছে, এদের এই বড় হবার মূলে কত পণ্ডিতের চিন্তা বিদ্যমান! কয়েকটি টাকার জন্য ভিক্ষুক-জীবনের অভিশাপ নিয়ে তোমার আত্মাকে বিনষ্ট করে ফেলো না। তোমার ভিতরে কত বড় শক্তি-সম্ভাবনা ঘুমিয়ে রয়েছে তা হয়তো তুমি জানো না। মানুষের আত্মা ফেলে দেবার জিনিস নয়। জ্ঞানচর্চার দ্বারা তোমার আত্মার ঘুমন্ত-শক্তিকে জাগিয়ে তোল। মানুষ যে কত বড়, সে কেমন বড় ও সম্মানী হতে পারে, তা হয়তো সে জানে না—তাই সে সম্মানের জন্য মানুষের দুয়ারে যায়, পথে আবর্জনার দামে তার অমূল্য রত্ন বিক্রয় করে।—পরিতাপ!

মানুষের বুকের ভিতর কী শক্তি ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগ্রত করে, সে অসাধ্য সাধন করবে। তাকে বলে দাও, সে অফুরন্ত শক্তির মালিক। কেন সে ছোট হয়ে আছে? নিজের সিংহাসন সামনে রেখে কেন সে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে? তুমি ছোট, তুমি হীন? পতিত অবজ্ঞাত হীন ছোটমানুষের কানের কাছে, আজ আমাদিগকে শক্তির গান গাইতে হবে। মানুষ পাপ ও মূর্খতাকে ঘৃণা করতে শিখুক! সে জ্ঞানসাধনার দ্বারা আত্মচেষ্টায় মানুষের সম্মান ও পূজা লাভ করুক। জলে বৃষ্টিতে কি গা ভেজে না? পিচ্ছিল পথে কি মানুষ হাঁটে না? পড়ে

যেয়ে কি পথের মাঝে বসে থাকতে হবে? আল্লাহর সৃষ্টিরহস্য বুঝতে পারিনে, দুঃখ-সুখ সবই তাঁর স্নেহের দান; কিন্তু দুঃখে পড়েছি বলে কি আমি দুঃখ জয় করতে চেষ্টা করব না? পাপ অন্যায় করেছি, অজ্ঞান অন্ধকারে আত্মা অচেতন হয়ে আছে—সে আঁধার কি ঘুচাতে হবে না?

ভদ্রলোক, রাজা, জমিদার বড়মানুষের ছেলে জ্ঞানে-অর্থে-পুণ্যে-ধর্মে বড় হবে; আর যারা ছোট, তারা চিরকালই ছোট হয়ে থাকবে, এ তোমরা কেউ বিশ্বাস করো না! যে তাঁতি, যে জেলে, যে কামার, যে রাজমিস্ত্রি সেও ভদ্রলোক হতে পারে। চাই তার জ্ঞান, চরিত্রশক্তি, বিনয় ও সত্যপ্রিয়তা। বিনয়ের অর্থ অত্যাচারী অহঙ্কারী ব্যক্তির পদধূলি মাথায় নেওয়া নয়। অত্যধিক বিনয় ও ভক্তির নম্রতায় মানবজীবনের অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে যায়। অসন্তোষ ও বিদ্রোহ—এ দুটিও চাই।

তুমি দরিদ্র নও, তোমার ভিতরের শক্তিকে তুমি জাগিয়ে তোল। জীবনকে যে-কোনো অবস্থায় যে-কোনো সময় তুমি নিজেকে বড় করে তুলতে পার। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, তোমাকে ছোটও হতে হবে না, এই বয়সেই তুমি জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর চিন্তার সঙ্গে যোগস্থাপন কর, জীবন ব্যর্থ হবে না।

সামান্য কৃষক হয়ে জীবনকে অবনমিত করে ফেলেছ, এ মনে করো না। আলোকরহস্য, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শরীরতত্ত্ব, ইতিহাস, বিবিধ ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করে কি তুমি তোমার জীবনকে ধন্য করতে পার না? স্কুল-কলেজে না-গেলেই জীবন মাটি হয়ে গেল? জানো না কোনো বাধাই জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না! চিন্তা ও সাধনা দ্বারা সকল বিঘ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। যে বিষয়ে ভালো লাগে; জীবনভরে তারই আলোচনা কর, তোমার সমাজকে তুমি মৃত্যুর পূর্বে তোমার কাজে ঋণী করে রেখে যেতে পারবে। উপাধি না পাও, কোনো ক্ষতি নাই। তোমার গুণের আদর না হয়, তাতেও বিশেষ কিছু মনে করবার দরকার নাই। জ্ঞান আলোচনায় যন্ত্রপাতি, বড় বড় অধ্যাপক ও অট্টালিকা দরকার নাই। অধ্যাপকের আড়ম্বর আর যন্ত্রপাতিতে মানুষ জ্ঞানের পথকে বরং অসরল ও অসহজ করে তুলেছে। জ্ঞানের পথ সবসময়ই আনন্দ-ভরা ও সহজ। অর্থলাভ, শিক্ষকদের শাসন, গুরুজনের অসহিষ্ণুতা আর সাধারণ মানুষের ধিক্কার-ভয় জ্ঞানের আনন্দকে নষ্ট করে ফেলেছে। এক-একটা বিষয় বুঝতে দার্শনিক পণ্ডিতদের কত দিন কত মাস কেটে গিয়েছে তা আমাকে একদিনেই ঠিক করে নিতে হবে। বিদ্রোহী অবুঝ মনকে পিটিয়ে বুঝাতে ও জানাতে হবে। এতে কি প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়? এই ভাবের জ্ঞানসাধনায় কি আনন্দ আছে?

যে-বিষয় আলোচনা করতে মনে খুব আনন্দ জন্মে, তুমি সেই বিষয়েরই আলোচনা কর, জীবনে তুমি কীর্তি অর্জন করতে পারবে।

আলস্য করে, শুধু খেয়ে-পরে, শুধু পৃথিবীর কলহ-দ্বন্দ্ব নিয়ে তুমি তোমার জীবনকে নিরর্থক করে দিও না—এ আমার অনুরোধ।

যে কুঁড়ে এবং আলসে, তার স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না; তার মন অবসন্ন হয়ে পড়ে।

শরীরের পরিশ্রম অপেক্ষা মাথার পরিশ্রমের মূল্য বেশি। হাত-পাগুলি মাথার আদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বুদ্ধিহীন মাথার আদেশ পালন করতে যেয়ে হাত-পাগুলির পদে পদে দুঃখ আর বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়।

জগতের শ্রেষ্ঠ ও সভ্যজাতিগুলি মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করেই বড় হয়েছে। সভ্যজাতির সামনে টিকে থাকতে হলে নিজেদের সম্মান ও জীবনের জন্য বেশি করে মাথার সদ্ব্যবহার

করতে হবে। চারদিকে যে এত বেদনা, এত দুঃখ দেখতে পাচ্ছ, এর একমাত্র কারণ জাতির বুদ্ধির দৈন্য।

ব্যাধি, অনাহার, এসব দরিদ্র-জাতির মধ্যেই বেশি দেখা যায়। শত শত বছর আমরা আমাদের জীবনের মূল্য বুঝি নি, কেন আমরা পথে পড়ে মরব? যে পরিশ্রম করে না, তার দুঃখ তো হবেই। বিশ্বের পথে যে চারিদিকে চেয়ে না-চলে, তাকে তো রথের চাকার তলে পড়ে চূর্ণ হতেই হবে।

চুরি-বাটপাড়ি করে দেশের মানুষকে কৌশলে ফেলে পয়সা অর্জন করা বিশেষ কঠিন নয়, কিন্তু এইভাবে পয়সা উপায় করে বেঁচে থাকা যদি অন্যায় না হয়, তাহলে অভাবগ্রস্ত লোকদের বিরুদ্ধে কথা বলবার অধিকার তোমার নাই।

জীবনে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে সুখী ও ভদ্রলোক হতে যেয়ো না; তারচেয়ে মুটে মজুরের মতো হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা বেশি মনুষ্যত্ব।

জীবনকে বড় করে তোলার ক্ষমতা, মানুষকে সুখ দেবার ও সাহায্য করবার ক্ষমতা, তোমার মধ্যে আছে। মানুষের সকল সুখের মূল—অর্থ। নিজের পরিবার ও দীনদুঃখীর সেবা করাও অর্থ ছাড়া হয় না। যার বুদ্ধি আছে, যে পরিশ্রম করতে পারে, তার দুঃখ নেই। জীবনে সে নিজে সুখ সংগ্রহ করে নিতে পারবে, পরকেও সে সুখ দেবে। যে অপদার্থ সেই দরিদ্র হয়। দরিদ্র হয়ে থাকা জীবনের পক্ষে একটা অপমান। যে-সমাজের সামাজিক মর্যাদা ঠিক রাখবার জন্য দরিদ্র হয়ে থাকতে হয়, সে-সমাজ ত্যাগ কর। দেশের মায়ায়, গ্রামের মায়ায় জীবনের দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? যেখানকার মানুষ তোমার শাদা কাপড়, তোমার চটক দেখে তোমার সম্মান করে; তোমার অভাব ও ঋণের জন্য তোমাকে ঘৃণা করে; সে স্থান ছেড়ে যেখানে পয়সা আছে সেখানে চলে যাও, নারীপুরুষ ছেলেমেয়ে কঠিন পরিশ্রম কর—দুঃখ থাকবে না। অলস পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে যারা প্রতিজ্ঞা করেছে, তারাই এ জগতে দুঃখী হয়ে থাকে।

মানুষের নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস নাই, তাই সে এত ভীরু। ভিখারির মতো সে মানুষের দয়ার পানে চেয়ে থাকে। কে তোমাকে এ জগতে পাঠিয়েছে? মানুষ তোমার খোদা নয়। যে তোমাকে এ জগতে পাঠিয়েছে, সেই তোমার আহার ঠিক করে রেখেছে। তোমাকেও পরিশ্রম করতে হবে, কাজ খুঁজে নিতে হবে; ঘরের মধ্যে বসে কাঁদলে চলবে না। খোদাতালা সবসময় তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কথা ভেবে তাঁরই ওপর নির্ভর করে তুমি সাগরে ঝাঁপ দাও। সাবধান, অন্যায়কে আশ্রয় করে কখনো খোদার নাম নিও না। অন্যায়ের সঙ্গে যার জীবন জড়িত হয়ে আছে, তার খোদাকে ডাকবার অধিকার নেই। মানুষ যেদিন অন্যায়কে অবলম্বন করেছে, যেদিন সে মিথ্যাকে আশ্রয় করেছে, সেদিন সে আল্লার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেছে। আল্লা দয়ালু—এই কথা ভেবে তোমার পাপ করবার কোনো অধিকার নাই। অবিবাহিত, চরিত্রহীন ব্যক্তিকে বরং ক্ষমা করা যায়; কিন্তু বিবাহিত, মিথ্যাবাদী, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, নিষ্ঠুর স্বার্থপর মানুষকে আমরা কখনো ক্ষমা করতে প্রস্তুত নই। যে অনাথিনী বিধবার সম্পত্তি অপহরণ করে, যে মানুষের সঙ্গে দাম্ভিক ব্যবহার করে, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করে না, যে নিন্দুক, যে দুর্বল নারীজাতির ওপর অত্যাচার করে; সে মূর্খ—সে খোদার শত্রু।

মানুষ যে-পথে গিয়েছে, সে-পথেই যে তোমাকে চলতে হবে, তা নয়। যে-পথে চলে হাজার মানুষের দুঃখের মীমাংসা হয় নি, দেখাদেখি তুমিও কেন সে-পথে চল। তোমাকে নতুন পথ খুঁজে নিতে হবে—যে-পথে কেউ যায় না, সেই পথেই তুমি চল। তোমার সত্য-জীবনের সঙ্গে তুমি

সন্নিস্থাপন কর—তুমিই আদর্শ ভদ্রলোক, আমি তোমাকে সম্মান করব। এ জগতে কে তোমাকে ছোট বলে ঘৃণা করে? করুক না—তুমি যেন নিজকে ঘৃণা না কর। তোমার মনুষ্যত্ব, তোমার বিবেক যেন তোমাকে ঘৃণা করার অবসর না পায়। পরাধীন জাতির ভদ্রলোক কে তা আমি ঠিক করে বলতে পারিনে। তোমাকে ছোট বলে কোন্ অভাগা ঘৃণা করবে তা আমি বুঝি না। ছোট বলে কেউ যদি তোমাকে হীনচোখে দেখে, দেখুক, আপত্তি নেই—যেন তোমাকে মিথ্যাবাদী দুর্বৃত্ত না বলে।

মিথ্যা সম্মানের জন্য কি পল্লির দরিদ্রঘরের সতী কুলবধূ চরিত্রহীন বড়লোকদের বিলাসিনী পতিতা বন্ধুদের স্বর্ণালঙ্কার ও বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে চায়? এ জগতে গায়ের জোরে অনেকেই ভদ্রলোক হতে পারে, গায়ের জোরে তোমার ভদ্রলোক হয়ে দরকার নেই।

জীবনের কাজ করতে হলে বড় সহিষ্ণুতা চাই। খোদার ওপর বিশ্বাস করে সহিষ্ণু হয়ে পরিশ্রম কর, দুঃখের মেঘ তোমার মাথার উপর হতে সরে যাবে। আমি এ-কথা পুনঃপুন বলছি—যে পাপী, মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড, সে যেন খোদার ওপর নির্ভর করে খোদার মহিমা ও দয়ার অপমান না করে। যে মিথ্যাবাদী মানুষকে ব্যথা দেয়, যে ভণ্ড মানবসমাজের দুঃখ বর্ধন করে—কে বলে খোদা তাকে ভালোবাসেন? কুকুরের মতো পরিত্যক্ত হাড় খেয়ে সে এ-জগতে বেঁচে আছে।

দুদিন পরিশ্রম করেই তুমি রাজা হবে, এ মনে করো না। দুই-একদিন বা দুই-একমাস কঠিন পরিশ্রম করে ফললাভ করবার আশা করো না। বহুদিন ধরে অল্পঅল্প পরিশ্রম করলে বরং ফললাভ হয়, কিন্তু অল্প কিছুদিন কঠিন পরিশ্রম করলেও কোনো লাভ হয় না। কোরান শরিফে বহুস্থানে সহিষ্ণুতার গুণ লেখা আছে। বড় বড় লোক যেমন পরিশ্রমী তেমনি সহিষ্ণু। মন অবুঝ হয়ে বলছে, কতদিনে এ কাজ হবে? কতকাল আর অপেক্ষা করব?—না, এমন কথা ভেবো না। বছরের-পর-বছর চলে গিয়েছে, আর সময় নেই—এরূপ মনে না করে সম্মুখের দিনগুলিকে যথেষ্ট মনে কর। আজকের এই নূতন দিন, বারো বছর পর কত পুরাতন হয়ে যাবে তা কি দেখেছ? আজকের এই নবীন ঊষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। এই সময়েই তোমার যাত্রা শুরু হোক। নিজকে বিশ্বাস কর, এই তুচ্ছ দিনগুলি তোমাকে কত সম্পদ দান করে তা তুমি পরে দেখে নিও। জীবনের দিনগুলির কি অপব্যবহার করা যায়? এই সাধের মানবজন্ম কি আর পাওয়া যাবে? তুমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেকদিন হতে মণিরত্ন কুড়িয়ে নিতে পার! অর্থ সঞ্চয় করা আর সময়ের সুব্যবহার করা একই কথা।

জীবন সাধনার পথে অনেক দুঃখব্যথা আসতে পারে; কিন্তু সেসব দুঃখব্যথাকে উপহাস করে তুমি সময়ের ব্যবহার কর। কেঁদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জীবন কাটালে কোনোই লাভ নেই, কেউ ফিরে তাকাবে না। পরীক্ষায় পাস করে চাকরির উমেদারিতে বছরের-পর-বছর পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ? এতে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তুমি নিতান্তই নির্বোধ। চাকরির উমেদারিতে থাকা, আর চাকরিজীবন অবলম্বন করা—সময়কে অনর্থক উড়িয়ে দেবার অধিকার তোমার কই! নিজের জন্য না হোক, পরের জন্য তোমার উদ্যম ও শক্তি ব্যয় কর। জীবনের মূলধনটিকে যত খাটাবে, ততই নিজের কল্যাণকর মুদ্রা লাভ হবে; সে মুদ্রা তুমি নিজেই ব্যবহার কর অথবা পরকে দাও। লোহার বাক্সে টাকা আটকিয়ে রেখে লাভ কী? হয় সেগুলি নিজে খাটাও, নাহয় পরকে খাটাতে দাও। পরীক্ষায় পাস করেছ বলেই কি তোমার জীবনের

সকল কাজ শেষ হয়েছে? শারীরিক পরিশ্রম করবার ক্ষমতা যদি তোমার বাহুতে না থাকে, জ্ঞানার্জন দ্বারা জীবনের দিনগুলি সার্থক কর। নিরক্ষর দেশবাসীকে তোমার চিন্তায় দীক্ষিত কর, এরচেয়ে বড় কাজ কি আর জীবনে আছে? বুদ্ধির দ্বারা মানুষের মঙ্গল করা মহাজনের কাজ। অর্থ অপেক্ষা জ্ঞানের দানই সমধিক মূল্যবান।

জীবনে কোনো পথ হচ্ছে না—পথ একটা তৈরি করে নাও না! ফিলিপ সিডনি বলেছেন—জীবনের সকল পথ যদি রুদ্ধ হয়, তবু আমি একটা তৈরি করে নিতে পারি। পুরুষের জন্য মুক্তির পথ আছেই। অবিশ্বাসী, পরমুখাপেক্ষী, বিশ্বাসহীন মানুষের জন্য কোনো পথ নাই। বিশ্বাস কর, তুমি ছোট হয়ে থাকবে না, না-খেয়ে মরবে না। আল্লাহ্‌র নামে সহিষ্ণু হয়ে পরিশ্রম কর, তোমার সম্মুখে মুক্তির পথ খুলে যাবে। সন্দেহে ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে মানুষ মৃত্যুলাভ করে। বিশ্বাসের বলে বাবর শাহ রাজত্ব লাভ করেছিলেন, ভিখারি শিবাজী রাজা হয়েছিলেন। মানুষ ইচ্ছা করে ছোট ও দরিদ্র হয়। তার ছোট ও দরিদ্র হবার কোনো কথাই নেই। তার শুধু সহিষ্ণু পরিশ্রম চাই। জয়ের জন্য শুধু আল্লার দিকে চেয়ে থেকো না। তোমার বাহুতে যে শক্তি আছে, তোমার মাথায় যে বুদ্ধি আছে, তার ব্যবহার তুমি কর।

নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করে মানুষের কাছে যে দয়া ভিক্ষা করে, সে অপদার্থ। মানুষের কাছে কেন ভিক্ষা করবে? আল্লাহ তোমাকে দুখানি শক্তিশালি হাত, দুখানি পা আর মুখে ভাষা দিয়েছেন—এই তো যথেষ্ট।

যে-কাজে প্রাণ ঢেলে দেওয়া যায় না, তাতে বিশেষ লাভ হয় না। কাজ করতে যদি মনে আনন্দ অনুভূত না হয়, তাতেও বিশেষ ফল হয় না। তুর্কিজাতির সম্মুখে ইউরোপের সমস্ত শক্তি বিধ্বস্ত হত কেমন করে? তুর্কিরা প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করত। দেশের মমতায় যারা যুদ্ধ করে, আর যারা টাকার জন্য যুদ্ধ করে—এদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি। পারস্যের সৈন্যকে কী করে মুষ্টিমেয় রোম-সৈন্য হারিয়ে দিয়েছিল? রোম প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছিল, তাই সে জয়লাভ করেছিল। প্রাণমন ঢেলে না দিয়ে অনিচ্ছায় সারারাত্রি পড়, কোনো লাভ হবে না। শরীর কোনো কাজ করে না, কাজ করে মন। পরিশ্রমের সঙ্গে কোনো আশা পোষণ করা মন্দ নয়—আশায় মানুষ পর্বত লঙ্ঘন করে। মানুষ অনেক সময় বলে থাকে, সময় নাই—প্রকৃত কথা তাদের প্রাণ নাই। প্রাণের ইচ্ছা না থাকলে কোনো কাজ কখনো সুসিদ্ধ হয় না। যে-কাজে প্রাণের যোগ আছে তা অতি সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন করা যায়।

জীবনে অর্থলাভ করার জন্যে, নিজেকে বড় করে তোলবার জন্য পরিশ্রম কর। কখনো বলো না—আমি যা বুঝি তা সম্পূর্ণ। সারাজীবনভরে জ্ঞানালোচনা করলেও তো বুঝার শেষ হবে না।

জ্ঞানের জন্য যে পরিশ্রম করা যায়, তার মূল্য খুব বেশি। জ্ঞানই জগতের কাজকে সরস, সুখময় ও সহজ করে তোলে। কাঠের বাক্সগুলি হাতে তৈরি করতে গেলে, একদিনে তো একটাও করা যাবে না এবং তার প্রত্যেক বাক্সের দাম পড়বে এক টাকার কম নয়। জ্ঞানবলে মানুষ ঐরূপ হাজার হাজার বাক্স প্রতিঘণ্টায় তৈরি করছে।

মাটিতে ধান ফেললে যে ফসল উৎপন্ন হয়, এ-কথা পণ্ডিতেরাই মানুষকে শিখিয়েছে। এ জগতের সকল কাজ জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। দিনেরাতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম কর—তার মূল্য পাবে ছাই। শারীরিক হাড়ভাঙা পরিশ্রমের সঙ্গে যদি তোমার বুদ্ধিবল থাকত, তাহলে তুমি রাজা হতে পারতে। সংসারের সকল কাজ চলছে, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে

পড়েছ—তবু বৃষ্টিবাদলার মাঝে, গভীর রাতে, দুপুর রৌদ্রে সাংসারিক কাজে হেঁটে বেড়াতে পার—আর তোমার আত্মার মঙ্গলের জন্য কোনো চেষ্টা করতে পার না?

অপক্ব অনুন্নত ও অবোধ মন নিয়ে বহু উপাসনা করলেও বিশেষ লাভ হয় না। হযরত মোহাম্মদ (দ.) বলেছেন, জ্ঞানীব্যক্তির এক মুহূর্তের উপাসনা মূর্খের চল্লিশ বৎসরের উপাসনার সমান। তুমি যে অবস্থায় থাকো না, যে কাজই কর না, তোমাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এই-ই তোমার ধর্মবিধান। পয়সার লোভে যুবক-বয়সেই বইপড়া শেষ করে এখন আরাম ভোগ করছ? এটা মানুষের জীবন নয়; কাজের চাপে বই-পুস্তক ধরবার মোটেই অবসর হয় না, এও মানুষের কথা নয়। জ্ঞানকে বাদ দিয়ে উপাসনাকে যে বেশি আঁকড়ে ধরে, সে অপদার্থ।

কারো কারো ধারণা, কোরান (শ.) ছাড়া কোনো পুস্তকে জ্ঞান নাই। এ অতি বড় মূর্খ মানুষের কথা। শিশু কি কোরানের (শ.) অর্থ গ্রহণ করতে পারে? কোরান (শ.) বুঝতে হলে, গীতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, আমাদের মনটিকে বহু জ্ঞানভাণ্ডারে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। জ্ঞান ও চিন্তার দ্বারা আত্মার দৃষ্টি খুলে দাও, সে-সমস্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আল্লাহ্‌কে অনুভব করবে, সে-সমস্ত কাজের ভিতর দিয়ে আল্লার উপাসনাতুল্য হবে। মূর্খের সম্মুখে কোরান (শ.) খুলে রাখ, সে সহস্রবার পাঠ করুক—ধর্মপথের কিছুমাত্র সন্ধান সে পাবে না। তার আত্মতৃপ্তির কোনো মূল্য নেই। জাতির যখন অধঃপতন হয়, তখনই সে এমন সংকীর্ণ পন্থায় নিজের জীবনকে সার্থক করতে চায়; সে বাদুড়ের মতো দীপালোক হতে চোখ বুজে বসে থাকে। মানুষকে সবদিকে চাইতে হবে, তাকে অনন্ত পথে চলতে হবে, তাকে সব কথা ভাবতে হবে—সে তো সহজ জীব নয়। জাতির পতন হলে, যে গর্বে আপনাতে আপনি ডুবে থাকে, তার সম্বল হয় শুধু ঘৃণা ও অহংকার। যাবৎ কোনো মহাপুরুষ তাকে নুতন করে পথ না দেখিয়ে দেন, তাবৎ সে আঁধারেই পড়ে থাকে। জ্ঞানসাধনা ব্যতীত জাতির দেহে শক্তি সৃষ্টি হয় না, সে তার ধর্ম ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে।

ইংরাজ কোথায় কোথায় না গিয়েছে? বরফের দেশে, দুর্গম গিরিশিরে, আকাশে, মরুভূমে, সমুদ্রের তলে—কোথায়ও তার যেতে বাকি নেই। সে ভীল, কোল, সাঁওতালি ভাষা হতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার চর্চা করেছে। সে কত পরিশ্রম করে। মুহূর্তকালও তো তার আলস্যে কাটে নাই। সাধনা ব্যর্থ হয় নাই।

নিজেকে এবং জাতিকে বড় করতে হলে তোমার সমস্ত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার চাই। তোমার নিজের বড় হবার ওপরেই জাতির বড় হওয়া নির্ভর করে। তুমি ছাড়া জাতি স্বতন্ত্র নয়। জাগরণের অর্থ তোমাদের সকলের জাগরণ। জাতিকে আহ্বান করা।

অনবরত কাজ করতে করতে মানুষ নিষ্ঠুর ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তা যেন স্মরণ থাকে। নিষ্ঠুর প্রাণহীন হয়ে বড় হওয়ায় কোনোই লাভ নেই।

নিজের জন্য এবং মানুষের জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। নিজের সুখটুকু আদায় করে নিতে পারছ বলে, তোমার তৃপ্ত হবার কোনো কারণ নাই। এই দুঃখ-দুর্দশাভরা দেশের অনন্ত দুঃখী মানুষের কথা না ভেবে, যে আপনার পূর্ণতায় প্রাণহীন হয়ে বসে থাকে, তাকে আর কী বলব? সে যদি উপাসনা করে, তা দেখে আমার মন যেন সুখী হয় না।

এ জগতে কতগুলি লোক আছেন, যাঁদের কাছে বসে-থাকা নিতান্তই অসম্ভব বলে মনে হয়। তাঁরা ভাবেন, জীবন আমাদের ক্ষুদ্র—কাজ অসীম। সারাজীবন ভরে কাজ করলে যা

আমাদের করবার ছিল, শেষ হবে না। আলস্য করবার সময় নেই। মুহূর্তগুলি তাঁদের কাছে অমূল্য জিনিস ; জীবনের সুখই হল তাঁদের সাধনা ও পরিশ্রম।

লিওনার্ড ডি ভিন্সি (Leonardo De vince) একসঙ্গে হাজার গণ্ডা কাজ করতেন, তাতে তাঁর কোনো ক্লান্তি হত না। স্যার জসুয়া রেনল্ডকে একসময় বন্ধুরা গ্রামে ধরে নিয়ে যান। সেখান হতে ফিরে এসে পুনরায় কাজে হাত দিয়ে তিনি যেন পুনর্জীবন লাভ করেন।

পৌশিন (Poussin) যতই বুড়ো হচ্ছিলেন, ততই তিনি সাধনার পূর্ণতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এত যে কাজ করা, তবু তাঁর তৃপ্তি ছিল না। প্রতিভাবান পরিশ্রমী কাজের লোক যারা, তাদের পরিশ্রম করে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। অনবরত কাজ, অনবরত পরিশ্রম—তবুও তাদের মনে হয় কিছু হচ্ছে না। ভার্জিল এগারো বছর ধরে তাঁর 'ইনিদ' কাব্যখানি লেখেন। লেখাশেষে তিনি কিছু হয় নি ভেবে আগুনে পোড়াতে যাচ্ছিলেন। ভলটেয়ার (Voltaire) কোনো বই লিখেই তৃপ্তিলাভ করেন নি। প্রকৃত কর্মী যাঁরা তারা সবসময়েই নিজেকে খুব দীন মনে করেন —নিজেদের দরিদ্র অপরাধী ভেবে কর্মের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। কাজের হিসেব করার অবসর তাদের থাকে না। তাদের লক্ষ্য হয়, জয়—সাফল্যের গৌরব পতাকা।

যে জাতক সময়ের মর্যাদা জানে, কাজের মূল্য বুঝে যারা পরিশ্রম করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তাদের ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল ! লক্ষ লক্ষ মানুষ আলস্যে কত কোটি কোটি টাকা মাটি করে ফেলে দিচ্ছে। সময়ের অপব্যবহার করা, আলস্য করে জীবনকে মাটি করে দেওয়ার অর্থ, জাতির কোটি কোটি টাকা অবহেলা করে নষ্ট করে ফেলা।

যে পরিশ্রম করতে তোমার মনে আনন্দ হয় তাই করো। তোমাকে প্রত্যহ কিছু-না-কিছু কাজ করতে হবে। কিছু কিছু করে কয়েক বছর ধরে বিশেষ কোনো কাজ করলে শেষে কাজের ফল দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

কাজ করলেই যখন অর্থ, সম্মান, সুখ ও কল্যাণ লাভ হয়, তবে কেন তা করবে না? আলস্যে জীবনকে নিরর্থক করে না-দিয়ে, সময় ও সুযোগ থাকতে কিছুকাল পরিশ্রম করে নাও। কে এমন হতভাগ্য আছে, যে জীবনের উন্নতি চায় না? পরমুখাপেক্ষী, অলস ও অভাবগ্রস্ত ভদ্রলোক হয়ে থাকায় কত লজ্জা ! তুমি সমাজের একস্তর নীচে নেমে যাও, বন্ধুরা তোমার সঙ্গে কথা না-বলুক, তোমার কোনো আত্মীয়ের নাম করবারও তোমার দরকার নেই, তুমি পরিশ্রম করে যেমন করে হোক অর্থ উপার্জন কর। তোমার ঘরে যেন ভাত থাকে, দান করবার জন্য তোমার হাতে যেন পয়সা থাকে, তোমার পত্নীর কাপড়ের যেন অভাব না হয়, অসাধুতা করে অভাব মোচনের প্রবৃত্তিও যেন তোমাতে না জাগে।

হযরত দাউদ (আ.) নিজহস্তে উদরান্নের সংস্থান করতেন। হযরত ঈসার (Jesus Christ) (আ.) কোনো চাকর ছিল না। হযরত মোহাম্মদ (দ.) পানি তুলতে গিয়ে ইহুদির হাতে চড় খেয়েছিলেন। ক্ষুধার তাড়নায় হযরতের পরিবার যখন ব্যাকুল, তখন তিনি পয়সা উপায় করতে গেলেন ইহুদির পানি তুলে। তিনি বন্ধুবান্ধবের কাছে ধার করতে যান নি। কাউকে নিজের অভাবের কথা বলতেও যান নি। বড়বংশের ছেলে বলে পানি তুলে পয়সা উপায় করতে লজ্জাবোধ করেন নি। মূর্খেরা বাহ্য অনুকরণ করেই মনে করে যে ছোন্নত [হযরত মোহাম্মদের (দ.) কাজের অনুকরণ] পালন করা হল; কিন্তু মহানবীর দীনতা, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর সৎসাহস, তাঁর মহামানবতা, তাঁর নৈতিক বল অনুকরণ করবার জন্য তাদের কোনো আগ্রহই নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যে মহানবীর জীবনের বিশেষত্ব, সে বিশেষত্ব

তোমার মধ্যে কই? সময়ের পরিবর্তনে মানুষের আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন হয়। জগতের রুচি ও সভ্যতা না পালন করে চললে, লোকের কাছে তোমার শিক্ষাদীক্ষা ও মনুষ্যত্বের আদর হবে না। পাপকে ধ্বংস করা, ন্যায়পরায়ণ হওয়া, জ্ঞান আলোচনা করা, মানুষের প্রতি প্রেম পোষণ করা—এসব মহাসত্যের কোনোকালে পরিবর্তন হবে না। মানুষেরা চান—তোমাদের পবিত্র জীবন, তোমাদের মনুষ্যত্ব, তোমাদের চরিত্র।

ঘুস খেয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার করে যে বাড়িতে দালান দিয়েছে, ধিক তার জীবনে। ধিক সেই অপদার্থ মানুষগুলোকে, যারা তাদের সম্মান করে। বাইরের চাকচিক্যের মধ্যে কি সম্মান বিদ্যমান? শুভ্র, সুরুচিসঙ্গত পোশাক এবং দেশের অবস্থা ও শিল্পবাণিজ্যের কথা বিবেচনা করে মূল্যবান সাজসজ্জা বেশি করে পরলে দোষ হয় না; কিন্তু তাই বলে কি সেগুলি চুরি করে পরতে হবে?

পোশাক পরে মনে যদি বিন্দুমাত্র অহঙ্কার আসে, তবে সেগুলি খুলে ফেলে দাও। আল্লার কাজ করবার জন্য সুবিধার নিমিত্ত অনেক সময় পদমর্যাদার নিদর্শনস্বরূপ ভালো পোশাক আবশ্যক হয়; কিন্তু সত্য জীবন অবলম্বন করতে যেয়ে যদি সেগুলি না জোটে, তাতে বিশেষ কী আসে যায়? মহর্ষি টলস্টয় এতবড় লোক হয়েও খালিপায়ে বেড়াতেন, মহর্ষি জনসন নোংরা পোশাকে থাকতেন। তোমাদের শুভ্র পোশাকের পূর্বে চাই তোমাদের শুভ্র আত্মাটি—তোমার চিত্তের স্বাধীনতা—তোমার মনুষ্যত্ব।

পরিবারের মানমর্যাদা বজায় রাখবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, ডিশ-বর্তন, দাসদাসী আবশ্যক; কিন্তু অবোধ জিজ্ঞাসা করি—মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে এই পদমর্যাদার মূল্য কী? যে তস্কর, যে পরস্বাপহারী দস্যু; তার পত্নীর গায়ে সোনার গহনা, তার ছেলেদের গায়ে জরির পোশাক দেখলে মনে কি ঘৃণা হয় না?

লোকে কী বলবে? ওরে পাগল! জীবনকে পাপ অন্যায় ও অজ্ঞানের আঁধার দিয়ে কলঙ্কিত করে ফেলছ, তা তো ভাবো না! ভাবো লোকে কী বলবে? অন্যায় করে, চুরি করে নিজকে সাজাতে পারছ না বলে ভাবছ লোকে কী বলবে?

মানুষের সমালোচনাকে একেবারেই উপেক্ষা কর, সৎ উপায়ে পয়সা অর্জনের জন্য যে-কোনো কাজ কর। লজ্জায় যখন মুখ কালো হয়ে আসবে তখন মহাপুরুষের জীবনের কথা ভেবো। কাজে কখনো মানুষের অপমান হয় না। অপমান হয়—অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকায়, অসত্য জীবনযাপনে, দরিদ্রকে সাহায্য করতে না-পারায়, দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হওয়ায়।

যদি সম্মান চাও, তাহলে মানুষের দুয়ারে কুল-মর্যাদা ভিক্ষা না করে জ্ঞানের সেবা কর। জ্ঞানের বজ্রবাণ দিয়ে তুমি আভিজাত্যের মাথা ভেঙে ফেল। কাজ কর, পরিশ্রম কর, কারো কাছে ঋণী হয়ো না। আমি কারো ধারি না, কাউকে ধার দিইনে, এসব কথা বলে মানুষের কাছে গর্ব করা কিন্তু নিষেধ। অপদার্থেরা তোমাকে সম্মান করুক বা না-করুক, তাতে তোমার কিছু আসে-যায় না। আমরা তোমাকে সম্মান করব। তোমার ছোট সরল জীবনকে দেখে তোমার কাছে কেউ না-আসুক কোনো ক্ষতি নাই। অসত্যের উপাসক, দুষ্ট, বদমাইশ লোককে বেশি সম্মান প্রদর্শন করো না।

হযরত মোহাম্মদ (দ.) বলেছেন—কেউ যদি কাপড় কেনে আর তার দেওয়া দামে যদি অন্যায়ের পয়সা থাকে, তাহলে সে কাপড় পরে সে যেন নামাজ না পড়ে।

দরিদ্র সরল কৃষক, কামার, দরজি, মিস্ত্রি, স্বর্ণকার, ক্ষৌরিক ও মুচি হও, সেও ভালো; তবু অসত্য জীবনযাপন করে ভদ্রলোক হতে যেও না! চিত্তের স্বাধীনতা হারিয়ে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে মানুষের কৃপা ভিক্ষা করে জীবনকে ব্যর্থ করে দিও না।

এ-কথাও বলে দিচ্ছি—যে সত্য পথ অবলম্বন করে, যে বিনয়ী ও সত্যবাদী জ্ঞানী পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগ রাখে, যে পরিশ্রমী; সে দরিদ্র হয়ে থাকবে না। সে বড় হবেই; তার দৃঢ়তা, তার সৎসাহস, তার নৈতিকবলের পুরস্কার সে পাবেই।

অনবরত কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন, তোমার এই পরিশ্রমের কোনো মূল্য নেই। কলিকাতার আদিম অধিবাসী কোনো এক ব্যবসায়ী-শ্রেণী যেমন পরিশ্রমী, তেমনি অর্থশালী; কিন্তু এদের চরিত্রবলের খুব অভাব। এইরূপ নীতিহীন স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন মূর্খ নিকৃষ্ট জাতির পক্ষে সাজে। সভ্য ভদ্র মানুষ এরূপভাবে অর্থশালী হতে ঘৃণাবোধ করেন।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন—'আমার রাত কাটে এবাদতে আর দিন কাটে পরিশ্রমে।' তুর্কি সম্রাট সেলিম সারাদিন কাজ করতেন। রাত্রিতে অল্পই নিদ্রা যেতেন, সারারাত্রি বসে বসে তিনি পড়তেন। জীবনে কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে তার আনন্দ ছিল না। নারীসঙ্গ তিনি পছন্দ করতেন না।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রত্যহ বিশঘণ্টা করে পড়তেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঘুমে পড়া নষ্ট হবে ভয়ে বালিশ মাথায় নিতেন না। মাইকেল এঞ্জেলো কাজ না করতে পারলে অস্থির হয়ে যেতেন। কোনো-কোনো সময়ে দুপুর রাত্রে জেগে উঠে তিনি কাজ শুরু করে দিতেন।

অর্থ পাবার লোভেই সকলে কাজ করে না। কাজ সবাইকে করতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দেশের মানুষের উন্নতির জন্যে কাজ করা দরকার। সম্রাট ষোড়শ লুই একখানি বই উৎসর্গ পাবার সম্মানের লোভে স্পিনোজাকে পেন্‌শন দিতে চেয়েছিলেন। স্পিনোজা চশমার পাথর সাফ করে জীবিকা অর্জন করতেন। সম্রাটের এই দান তিনি গ্রহণ করেন নি—বইও উৎসর্গ করেন নি। তিনি এত পড়তেন যে কোনো-কোনো সময়ে তাকে অনবরত দুই-তিনদিন ধরে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে দেখা যেত। হাঙ্গেরি দেশের জনৈক গণিতজ্ঞ গ্রীষ্মকালে দুইঘণ্টা এবং শীতকালে চারঘণ্টা মাত্র শুতেন। বেলী প্রত্যহ চৌদ্দ ঘণ্টা চল্লিশ বৎসর ধরে পরিশ্রম করেন।

যে জাতির মানুষ শ্রমশীল, যারা জ্ঞান-সাধনায় আনন্দ অনুভব করে, তারাই জগতের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। কর্তব্যজ্ঞানহীন নীতিজ্ঞানশূন্য আলসে মানুষের স্থান জগতে সকলের নিচেই হয়ে থাকে। তারা জগতের অবজ্ঞার ভার, অসম্মানের অগৌরব নিয়ে বেঁচে থাকে। জগতে ধনসম্পদ জয় করতে হলে, জীবনের কল্যাণ লাভ করতে হলে, পরিশ্রম ও সাধনা চাই।

কিছুদিন আগে চিৎপুর রোডের একটা দোকানে এক টুপি-বিক্রেতাকে একটা ছোট ঘরে বসে একখানা ইংরেজি নভেল পড়তে দেখেছিলাম। আমার একটু আশ্চর্যই বোধ হয়েছিল। যারা লেখাপড়া না-শিখেও আরামে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তারা তো বই পড়বার ধার ধারে না। তারা মনে করে ওগুলি বাজে কাজ। কবে সেইদিন আসবে, যেদিন দেখতে পাব গাড়োয়ান ও কোচোয়ান বই খুলে পড়ছে, নাপিতের দোকানে রাজনীতি আলোচনা হচ্ছে।

জাতির হাজার হাজার জীবনকে মৃত্যু হতে বাঁচাবার উপায় কী? দেশের লক্ষ মানুষ শরীরে বেঁচে থাকলেও তারা মরে আছে। যে-জাতির এত মানুষ মরে আছে, সে-জাতি যে অতি শীঘ্রই শেষ সমাধি লাভ করছে, এ তো কবির কল্পনা নয়। জেলখানায় রাজদরবারে রান্নাঘরে বা রাস্তায় বিপণিতে, পাহাড়ের মাথায় অথবা সমুদ্রের উপর যেখানেই থাকো না, জ্ঞানরাজ্য হতে

রত্নমাণিক আহরণ করে তুমি তোমার জীবনকে সার্থক কর। তোমার কল্যাণের পথ তোমার হাতেই রয়েছে। কেন ভিক্ষুকের সঙ্কোচ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ? স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেট না পেলে তোমার জীবনের মূল্য হবে না, কে তোমাকে এ-কথা বলেছে? মানুষ তোমার সার্টিফিকেট দেখবে না; দেখবে তোমার জ্ঞান, তোমার মনুষ্যত্ব, তোমার নৈতিক বল, তোমার চরিত্র। মানুষ তোমার দুর্জয় শক্তির সামনে লুণ্ঠিত হবে—এ তুমি বিশ্বাস কর। তোমার উকিল মোক্তার বা স্কুলের মাস্টার হবার দরকার নেই, সুতরাং সার্টিফিকেট না হলেও তো তোমার চলবে। চাই তোমার মনুষ্যত্ব ও প্রাণশক্তির জাগরণ—পরিশ্রম করার ক্ষমতা। হযরত মোহাম্মদ (দ.), ঈসা (আ.), বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ—এঁরা কি প্রবেশিকা অথবা বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যপ্রচারের শক্তি অর্জন করেছিলেন?

কলেজে যেতে পার নি, তুমি ইংরেজি জানো না—তা বলে তোমাকে মানুষ হতে কে নিষেধ করেছে? কাপড় বেচতে বেচতে কি তুমি বিজ্ঞানের আলোচনা করতে পার না? চাউলের বস্তার কাছে কি তুমি একখানা ভালো বই রেখে দিতে পার না? কেন গর্দভের মতো সিঁথি তুলে জীবনকে ব্যর্থ করে দিচ্ছ? কাপড় বেচতে অসম্মান হয় না; তুমি যে জ্ঞান-দরিদ্র, তুমি যে অবোধ, তোমার মনুষ্যত্ব নাই, তোমার চরিত্রবলের অভাব, তুমি নিষ্ঠুর ও কটুভাষী—এতেই অপমান, অন্য কারণে নয়। জ্ঞান আহরণ ব্যতীত মানুষের কী করে কল্যাণ হবে? মানুষ না হয়ে পশু হয়ে বাঁচতে শুধু আনন্দ কোথায়? শুধু রাজনৈতিক শিক্ষায় মনকে আবেগ-ব্যাকুল করে তুললে চলবে না। তোমার চরিত্রবান হওয়া চাই, তোমার মানুষ হওয়া চাই; কারণ তোমার মনুষ্যত্ব, চরিত্রবলের ওপরই তোমার এবং তোমার জাতির বড় হওয়া নির্ভর করে। সমাজসেবক হয়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কিন্তু তুমি সামান্য একটু স্বার্থত্যাগ করতে পার না—তুমি অনাথিনী বালিকার অশ্রুকে উপহাস কর; মূঢ় তুমি, অজ্ঞ তুমি। ধর্মের অর্থ বিশেষ-কোনো মতে বিশ্বাস নয়—ধর্মের অর্থ মনুষ্যত্ব, জীবনের পবিত্রতা,ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মার বিনয় ও দৃষ্টি।

এক-এক কাজে এক-একজনের বিশেষ মন থাকে। যে-কাজে মন চায়, তাই করা উচিত—সেই কাজে শেষপর্যন্ত লেগে থেকে জীবনকে সার্থক করতে হবে। জগতের প্রত্যেক কাজে, জীবনের প্রত্যেক সাধনায় মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া যায়। উকিল, ডেপুটির কাজ অপেক্ষা কাপড়-বিক্রেতার মর্যাদা খুব কম, তা আমি মনে করতে পারিনে। এক মহাউদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা অনন্ত মানুষ অনন্ত পথে অগ্রসর হচ্ছি, কাকে তুমি ঘৃণা করবে? মিস্ত্রির নীরস বাঁটালির আঘাতে, রজকের কাপড়ের ঘায়ের শব্দে, পণ্ডিতের সুললিত শ্লোকে—আমি শুনেছি একই গান। কাকে বলব, তুমি ছোট। কাপড়-বিক্রেতা তার মোটাকাপড় দিয়ে দীনদুঃখীর সেবা করতে পারে না? তার দীন উপহারে সতী বালিকার লজ্জা নিবারণ হয় না? এগুলি ছাড়া এবাদত কাকে বলে, তা আমি বুঝি না। তুমি বড় সাহিত্যিক, তুমি বড় বৈজ্ঞানিক, দিকে দিকে তোমার যশোগৌরব ছড়িয়ে পড়েছে, তুমি শ্রেষ্ঠ কবি, প্রকৃতি মুখর হয়ে তোমাকে কেবল গান জোগাচ্ছে, মানুষ তোমাকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়; ওসব দেখে আমার মনে তৃপ্তি আসে না। দীন নয়নের একটা কটাক্ষ তোমার প্রাণকে চমকিত করে তোলে কিনা? শিশুর হাসি তোমার প্রাণে আনন্দ আনে কিনা? দুঃখীর নয়নজলে তোমার কর্মনিরত হাতখানি একটু কাঁপিয়ে তোলে কিনা? তোমার গ্রামে সেই একটা দুঃখী নারীর সিক্ত চোখের স্মৃতি তোমার বুকে লেগে রয়েছে কিনা! অভাগার করুণ চিৎকার তোমার কানে পড়ে কিনা? যদি বল আমার সময় নেই, আমি বড়

ব্যস্ত, আমি দেশসেবা করতে যাচ্ছি, আমার চিন্তার মধ্যে কেউ বাধা দিও না—আমি বলব তোমার বিজ্ঞানের হাড়গোড়গুলি সমুদ্রজলে ফেলে দাও, তোমার কবিতার বইগুলি পুড়িয়ে ফেলো—তোমার দেশসেবার দরকার নেই, আমার জন্য তুমি লড়াই করতে যেয়ো না। দেশসেবার নামে যেদিন সুলতান প্রথম বায়েজিদ তার নিরপরাধ ভাইকে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করলেন, সেদিন আল্লাহ্ নীরব ভাষায় বলেছিলেন, এর নাম দেশসেবা নয়। অবিচার করে রাজধর্ম পালন করে দরকার নেই। নিষ্ঠুর-প্রাণ হয়ে কবিতা লেখবারও কোনো প্রয়োজন নেই।

ছোটলোকের ছেলে ছোট হয়, লোকে এ-কথা বলে থাকে। মানুষ যাদের মধ্যে বাস করে, তাদের চিন্তা, প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের ওপর বড়ই ক্রিয়া করে সত্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের আত্মাকে চেপে মেরে ফেলে। কিন্তু মানুষ কখনো এ-জগতে ছোট হয়ে আসে না। যদি সুবিধা ও সুযোগ থাকে, তাহলে হীন মানুষের ছেলেও কালে বরেণ্য হতে পারে। মানুষেই মানুষকে ছোট ও নীচ করে ফেলে। যে শিশু পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, দেশ ও সমাজের মানুষের কাছে জীবনে বড় কথা শোনে নি, সে কেন বড় হতে চাইবে? কুকাজ করে হীনতার পরিচয় নিয়ে আমরা চারিদিককার সবাইকে যদি গৌরব করতে শুনি, তাহলে আমার দুর্বল মন ধীরে ধীরে নীচ হতে থাকবে না কেন?

সাহিত্যের কাজ মানুষকে তার চারিদিককার মন্দশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা, তার মধ্যে সমাজ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে অগ্রাহ্য করে ন্যায়, সত্য ও আল্লাহকে মেনে নেবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দেওয়া।

নিজের সুবিধার জন্যে সন্তানকে নীচ ও পাপ কাজ করতে প্ররোচনা দিও না। সে তো তোমার সন্তান নয়, সে এসেছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, আল্লাহ্‌র কাজ করবার জন্যে। তুমি তার সাধনা পথের সহায় হও, তার বিবেক ও সুবুদ্ধির ওপর হাত দেবার কোনো অধিকার তোমার নাই।

ক্রমওয়েল প্রথমজীবনে একটা মেঠো চাষা ছিলেন, অথচ শেষজীবনে তাঁর শক্তিতে বিলেতের শাসনতন্ত্র একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। ক্রমওয়েলের জীবনসাধনা ইংরাজ জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

নেপোলিয়নের প্রিয়-ঐতিহাসিক জেনারেল জেমিনি প্রথম জীবনে কোম্পানির কাগজের দালাল ছিলেন। কাপ্তান কুক সূচ-সূতা বেচতেন।

দার্শনিক ব্রাউন ছিলেন তাঁতি। প্রাণীতত্ত্ববিদ আলদ্রুভিনদা প্রথমজীবনে জনৈক ভদ্রলোকের বালক-ভৃত্য ছিলেন। জ্যোতির্বিদ পিকার্ড যখন বাগানের মালী ছিলেন, তখনই তিনি সাধনার পথ ঠিক করে নিয়েছিলেন। এঁরা প্রথমজীবনে খুব ছোট কাজ করতেন। এই ধরনের ছোট কাজ আমাদের দেশে যদি কেউ করে, লোকে তাকে ছোটলোক বলবে। ছোটলোকদিগকেই মানুষ হতে হবে। জাতির প্রাণ এরা। জাতিকে এরাই ধ্বংস করে, এরাই বাঁচিয়ে তোলে।

যে ছোট হয়ে আছ, সে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ করো না। তোমার মস্তিষ্ক ও শরীর নিয়ে তুমি তোমার বড় হবার পথ মুক্ত করে নিতে পার।

তুমি সামান্য কাজ করছ? তোমার জীবনকে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের গৌরব দিয়ে বড় করে তুলতে চাও? তাহলে বন্ধুবান্ধব ও মানুষের উপহাসকে উপহাস করে জ্ঞানের আলোচনা করো। বিদেশী ভাষা পড়বার দরকার নেই—বিদেশী ভাষা জানলে মানুষের সম্মান বাড়ে এ-কথা ভাববার দরকার নেই। তুমি তোমার নিজের ভাষার ভিতর দিয়েই চরিত্রবলে,

সৎসাহসে ও বুদ্ধিতে বড় হতে পার। দেশের মানুষের কাছে তোমার সম্মান হবে। মানুষ তোমার স্পর্শে এসে সুখী হবে।

তুমি খেলা করে, শুধু মানুষকে সেলাম জানিয়ে, বড় মানুষকে মিথ্যা তোষামোদ করে কেন তোমার জীবনকে বিফল করে দিচ্ছ?

বিলেতে এবং অন্যান্য দেশে বহু মানুষ জীবনের প্রথম অবস্থায় খুব ছোট ছিলেন। উত্তরকালে পরিশ্রম ও জ্ঞানসাধনা দ্বারা তারা দেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন।

শুধু নভেল পাঠ করলে তোমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না। নভেল-উপন্যাস, কাব্য-কবিতা তোমার মনে শক্তি, সাহস, সুবুদ্ধি ও উদ্যম আনতে পারে; কিন্তু মানবজীবন শুধু শক্তি, সাহস, উদ্যম আর সহানুভূতিতে বেঁচে থাকবে না। শক্তি আছে, কিন্তু সে-শক্তি প্রয়োগ করবার পন্থা তুমি জানো না; তোমার সাহস আছে, তোমার উদ্যম আছে, তোমার প্রাণে প্রেমও আছে—কিন্তু অস্ত্রহীন হয়ে সাহসী হয়ে লাভ কী? অন্ধ হয়ে উদ্যমশালী হয়ে কী ফল? হীন হয়ে প্রাণে প্রেম পোষণ করলে মানব-দুঃখের অবসান হবে না।

মনুষ্যত্ব, সৎসাহস ও চরিত্রবল অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেশের আইন, বর্তমান জগতের অবস্থা, জমাজমি সংক্রান্ত মোটামুটি জ্ঞান, হিসাবপত্রের জ্ঞান—এসব শিখতে হবে, নইলে তোমার মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমার চেয়ে ছোট যারা, তাদের কাছে তোমাকে বোকা ও অপ্রস্তুত হতে হবে। জীবনে ধনীলোক হতে পার আর না-পার, জগতে বড় হতে চেষ্টা কর।

তোমার যদি বড় অভাব হয়ে থাকে—মানুষের দুয়ারে হাত পেতো না। শারীরিক পরিশ্রম করে, ছোট ব্যবসা করে যদি সে অভাবের মীমাংসা হয়—লজ্জা করো না, সেই ছোট কাজ করেই তোমার অভাবের মীমাংসা কর। তোমার পত্নী, তোমার মা, তোমার ছেলেমেয়েগুলিকে তুমি সুখ দাও! তোমার এই দীনজীবন দেখে আমি তোমায় ঘৃণা করব না।

এই ছোট কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে পণ্ডিত ও জ্ঞানীব্যক্তিদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হবে। তাদের বই তোমার পড়তে হবে। তোমাকে, তোমার পত্নীকে, তোমার মা, তোমার বোন, তোমার কন্যা, তোমার প্রতিবেশী সকলকে ভালো কথা শুনাতে হবে। যে উপন্যাস চিত্তকে মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন করে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিতে সমর্থ, চিত্তকে বিনয়ী, কোমল ও মধুর করে তোলে, যা আত্মার পশুভাব চূর্ণ করে প্রেমের মর্যাদা শিক্ষা দেয়, যা নারীর সুষমা সৌন্দর্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়—সে উপন্যাস পড়তে পারো। নানা দেশের ইতিহাস, বিজ্ঞানের বই, জগতের মহামানুষ ও পণ্ডিতদের জীবনী—এসব তোমাকে পড়তে হবে।

মানুষের শ্রদ্ধার জন্যে লালায়িত হয়ো না, তুমি শুধু তোমার কাজ করে যাবে। সাধনা পথে শ্রদ্ধার সম্মানের জন্য লালায়িত হলে তোমার সাধনা পণ্ড হয়ে যাবে।

মনের চাঞ্চল্য ও ধৈর্যশূন্যতা মানুষের সমূহ অনিষ্টের মূল। বছরের-পর-বছর চলে যাক—পল্লির শান্ত-শীতল গৃহের বারান্দায় বসে তুমি তোমার পবিত্র নিরীহ জীবন, তোমার কর্ম, তোমার জ্ঞানানুশীলনের সাধনা দিয়ে কাটিয়ে দাও। কি ব্যবসাক্ষেত্রে, কি শারীরিক পরিশ্রমে, কি পাঠকার্যে—কখনো ধৈর্য হারিও না। যেতে দাও বছরের-পর-বছর—তোমার জন্যে গৌরব অপেক্ষা করছে।

তোমরা ছোট সুন্দর পরিবারকে নিয়ে দরিদ্র সচ্ছল অবস্থায় জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে যোগ রেখে যদি তুমি মরে যেতে পার—তোমার জীবন সার্থক হবে।

যেখানে আছ, সেখান হতেই তোমার যাত্রা শুরু হোক—এখান হতেই তুমি তোমার জীবনকে বড় করে তুলতে পার। কোথায়ও যাবার দরকার নেই!

যে-সমস্ত মানুষ মানুষের কাছে পণ্ডিত বলে উপাধি পেয়েছে তাদের যদি চরিত্রবল না থাকে, তাদের মন যদি সংকীর্ণ ও নিষ্ঠুর হয়— তাদের কাছে যেয়ো না, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করো না।

যার চরিত্রবল নাই, মানুষকে যে ভালোবাসতে জানে না, অভাব যার মোটে ঘোচে না, মানুষের কাছে হীন হয়ে সম্মান ভিক্ষা করে, সেই অপদার্থ শিক্ষিত হলেও সে শিক্ষিত নয়। তোমাকে জাগতে হবে। পুনঃপুন বলছি—ইচ্ছা করলে তুমি বড় হতে পার। তুমি জাতির সেবা করতে পার। তোমার হাতে মানবসমাজের বহু কল্যাণ হতে পারে। তোমার বিরাট আত্মা, তোমার পূত-শুভ্র চরিত্র নিয়ে তুমি আজ ঊষার আলোর পথের দিকে তাকাও। সমস্ত গগন-পবন আজ তোমায় ডেকেছে। এই জড়দেহের ক্ষুধাগুলি আজ চূর্ণ করে ফেল। তোমার আত্মার কিরণ দুঃখদগ্ধ আর্তপাপ নরনারীর কাছে শুভ ও কল্যাণ বয়ে নিয়ে যাক। আজ সকল পাপ তোমা হতে খসে পড়ুক।

বাপমায়ের অন্ধস্নেহ, আত্মীয়বান্ধবদের চিন্তাশূন্য মন্তব্য তোমার আত্মাকে যেন দুর্বল না করে ফেলে। মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেবার জন্যে, এই দুটির মতো পরম শত্রু আর নাই।

তুমি নিজেকে কখনো নিঃসহায় ও দরিদ্র মনে করো না। যেদিন তুমি জন্মেছিলে সেদিন আল্লাহ তোমাকে দুখানি হাত, দুখানি পা আর একখানা মাথা দিয়েছিলেন—মানবজীবনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট সম্বল।

ভদ্রতা

যুক্তরাজ্যের নায়ক একসময় ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। তাঁর গাড়িতে মোটে স্থান ছিল না—লোকের ভিড় খুব বেশি হয়েছিল। এমন সময় একটা নিগ্রো রমণী সেই গাড়িতেই উঠল, দেশনায়ক অমনি উঠে দাঁড়িয়ে সেই সামান্য নারীকে বসবার স্থান দিলেন। বাকি পথটুকু তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

রাষ্ট্রনায়কের এই ভদ্রতা কি মহত্ত্বের পরিচয় নয়? রমণীটি নিম্নশ্রেণীর, তাকে সম্মান করে বিশেষ লাভ কী। তার মতো সামান্য স্ত্রীলোকের পক্ষে দেশনায়কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাই ভদ্রতা—এইসব চিন্তা রাষ্ট্রপতির মাথাকে অস্থির করে নি। হোক না সে পথের নারী, নীচ বংশোদ্ভবা—তাতে কী আসে যায়। নীচ বলে, ছোট বলে, ভদ্রব্যবহার করতে দেশনায়ক লজ্জা করেন নি।

রেলগাড়ির দুয়ারের কাছে কোনো লোক এলে সবাই যদি হেঁকে বলি—স্থান নাই; তাতে মোটেই ভদ্রতার পরিচয় দেওয়া হবে না। মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আমি যদি জায়গা জুড়ে বসে থাকি—তাতেও বিশেষ মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব দেখানো হবে না।

যিনি ভদ্রলোক, তিনি ভদ্রতার পরিচয় দেন। একটি কঠিন কথা বলা, একটি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা কি কম লজ্জার কথা? কঠিন কথা বলে তো প্রাণে আনন্দ অনুভব করবার কিছু নেই।

সারাদিন পরিশ্রম করে বড় ক্লান্ত হয়েছ, একটা অবোধ মানুষ এসে তোমাকে বিরক্ত করছে, তাই বলে তাকে কঠিন কথা বলবে? ডাকঘরে, বাজারে, কাছারিতে অথবা থানায়—যেখানেই তুমি থাকো না, তোমাকে সব জায়গাতেই ভদ্র ও মধুর-স্বভাব হতে হবে।

ডাকঘরে কাজ কর, ভিতরে পাখার নিচে বসে মনে মনে যেন ক্ষমতার গর্ব না আসে, বাইরের লোকগুলির ওপর যেন কোনোরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করবার প্রবৃত্তি তোমার না জাগে।

থানাঘরের চারিদিকে তোমার হুকুম তামিল করার জন্য সিপাইরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোমার ইঙ্গিতে তারা মানুষ পর্যন্ত খুন করে ফেলতে পারে, কিন্তু তবু তোমাকে নম্র ও মধুর-স্বভাব হতে হবে, কারণ তুমি ভদ্রলোক। কারণ ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করতে তুমি লজ্জাবোধ কর, বিনয়ে মধুর হয়ে মানুষের সঙ্গে ভদ্রব্যবহার কর, চোর-বদমাইশকে শাস্তি দাও কর্তব্যের খাতিরে—ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নয়।

এ জগতে উগ্র হয়ে দুর্বলকে কঠিন কথা বলবার অধিকার কারো নেই। মানুষ সবসময়ই দরিদ্র, এ জগতে এতটুকু অহঙ্কার করবার সুযোগ আমাদের নেই। মাথা নত করে কর্তব্যের আদেশ মেনে জীবনপথে অগ্রসর হতে হবে।

এমার্সন বলেছেন—একটা সুন্দর মুখের চেয়ে একটা কুৎসিত মুখের মধুর কথা অধিকতর সুন্দর। সত্যই তো সুন্দর সুশ্রী মুখ আমাদের চিত্তকে আনন্দ দান করে না—মধুর জ্ঞানপূর্ণ সরল আলাপে কাফ্রির জঘন্য চেহারাও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে!

জনসন ভদ্রতা জিনিসটাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তবুও তিনি এত ভদ্রতার পরিচয় দিতেন, যা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। যে ভদ্রতার মনের সঙ্গে যোগ নাই, তা হয়তো তিনি ভালোবাসতেন না।

পরাধীন দেশে মানুষ সবসময়ে যথার্থ বিনয়ের পরিচয় দিতে সক্ষম হয় না। অভাব ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ভদ্রতাও অনেক সময় খাঁটি হয় না। যাকে মানুষের ভয় করে চলতে হয়, তার পক্ষে সবসময় সত্য ভদ্রতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। জীবনের এই কঠিন কলঙ্ক হতে মানুষকে সবসময় মুক্ত হতে চেষ্টা করতে হবে। কারণ এ অবস্থাটা আত্মার পক্ষে খুবই অপমানজনক। স্বাধীন মুক্ত মানুষের ভদ্রতাই প্রকৃত ভদ্রতা। দরিদ্রের পক্ষে ভদ্র না হয়ে উপায় কী? দুর্বল বা অনুগ্রহদগ্ধ জীবের পক্ষে বিনয়ে নম্র হওয়া ছাড়া পথ কই?

স্যার হেনরি সিডনি তাঁর পুত্র ফিলিপ সিডনিকে বলেছিলেন, তুমি বড়বংশে জন্মেছ, বিনয় ও চরিত্র-মহিমায় তোমাকে তা প্রমাণ করতে হবে। তোমার সৎস্বভাব, তোমার বিনয়নম্র ব্যবহার, তোমার সত্যপ্রীতি— তোমার উচ্চকুলের পরিচয় দেবে। পিতার নাম করে যেন তোমাকে বড়বংশের লোক বলে পরিচয় দিতে না হয়। যদি ভীরু, সংকীর্ণহৃদয় ও নীচাশয় হও, তাহলে তোমার বড়বংশের কলঙ্ক হবে। পিতার এই উপদেশগুলি ফিলিপ সিডনি গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি যে-মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা পাওয়া যায় না। ভদ্রতার প্রধান উপাদান ত্যাগ। স্বার্থে প্রাণ পূর্ণ হয়ে আছে, পরের জন্য এতটুকু কষ্টস্বীকার করতে মন চায় না, নিজের দাবি কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিতে খুব মজবুত, সবসময় নিজের সুখের সম্বন্ধে মন জাগ্রত; কিন্তু বাইরের লৌকিকতার খাতিরে প্রাণহীন ভদ্রতার পরিচয় দিচ্ছ, দেখা হলেই আদাব-সালাম করে বিনয়ে মাথা অবনত করছ, এরূপ ভদ্রতার বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে হয় না। পরের জন্য ত্যাগ-স্বীকার, নিজের সুখের সঙ্গে সঙ্গে পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখো। পরকে আঘাত না-দেওয়া, অর্থ দিয়ে হোক বা পরিশ্রম করে হোক অন্যকে সাহায্য করার নাম ভদ্রতা।

ছোটবংশে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের কি ভদ্র হবার অধিকার নেই? সাধনার সামনে কিছুই তো অসম্ভব নয়। মনের অহঙ্কার দূর করে দিয়ে, নিরপেক্ষ সমালোচক হয়ে নিজের স্বভাবের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখো। সেখানে যে ভুলটুকু আছে, চরিত্রের যে দৃঢ়তা আছে, তা ধীরে ধীরে দূর করে ফেল, জ্ঞানরাজ্য হতে সর্বদা বড়মানুষদের অমূল্য উপদেশগুলি পালন কর—তোমাকে কেউ ছোটলোকের ছেলে বলতে সাহস পাবে না।

মানুষ মানুষকে যে ঘৃণা করে, তার কারণ কী? যার মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই, যে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর যার ব্যবহার মিথ্যার সঙ্গে জড়িত; বল দেখি লোকে যদি তাকে ঘৃণা করে, তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়? এ-কথাও ঠিক, মানুষ মানুষকে অনেক সময় অন্যায় করে ঘৃণা করে। অন্যায় করে মানুষকে অত্যধিক ঘৃণা করলে মনের অবনতি ঘটে।

ভদ্রঘরের ছেলেই যে ভদ্র হবে, এমন কোনো কথা নয়। প্লেটো খুব বড়ঘরের ছেলে ছিলেন না; তবুও জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর স্থান কত উঁচুতে। দার্শনিক ক্লিয়ানথাসের (Cleanthus) বাপ ছিলেন বাগানের মালী। ইউরোপিডিসের (Europides) বাপও ছিলেন

মালী। জ্যোতির্বিদ পিথাগোরাসের (Pythagores) বাপ কামারের কাজ করতেন। ডিমস্থেনিসের বাপ ছুরি-কাঁচি তৈয়ার করতেন। কবি ভার্জিলের বাপ ছিলেন কুম্ভকার। কত রত্ন কত জায়গায় পড়ে থাকে; তার খবর কে রাখে? প্রতিকূল অবস্থার চাপে কত প্রতিভা কত মহৎ আত্মা অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত হয়ে পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করে। কবি গ্রে বলেছেন—সমুদ্রের অতল তলে কত মণিমুক্তা লোকচক্ষুর অন্তরালে বালিকাদার মধ্যে পড়ে থাকে, কত গিরি-উপত্যকায় কত ফুল ফুটে আপন মনে ঝরে পড়ে।

যে ছোট হয়ে পড়ে আছে, সে হয়ত ছোট নয়। তার মধ্যে কত মনুষ্যত্ব, কত মাধুরী ঘুমিয়ে আছে, তা তুমি-আমি না-জানতে পারি, সুবিধা ও সুযোগ পেলে সেও মানবসমাজে সম্মান পেত।

মানুষ যতই ছোট হোক, যতই সে অবজ্ঞাত হয়ে থাকুক; তার মধ্যে অসীম ক্ষমতা, অনন্ত প্রতিভা ঘুমিয়ে রয়েছে, অনুকূল বাতাস পেলে তার ভিতরকার রূপ ও মহিমা অনন্ত শিখায় ফুটে উঠবে।

জাতির ভিতরকার লক্ষ মৌন আত্মাকে ডেকে তুলতে হবে। যে-জাতির মাঝে সাধারণ মানুষের সামনে মুক্তির পথ খোলা নেই, সে-জাতি দিন দিন দুর্বল হতে থাকে। তাদের শক্তি-সাধনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কতকগুলি ভদ্রলোক ও উচ্চবংশ নিয়ে জাতি কখনো গৌরবের পথে অগ্রসর হতে পারে না। মানবসমাজে মানুষের ঘরে নিত্যনূতন আত্মা নবীন শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে, তাদের গতিপথ রুদ্ধ করে রাখো, তাতে জাতিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আভিজাত্য-গর্বের মূলে কিছু সত্য থাকলেও মিথ্যা বংশগৌরব এবং ছোটকে অবজ্ঞা করার পাপে দেশ ও জাতির সমূহ ক্ষতি হয়। যে ছোট সে যদি বড় গুরুর আসন নিয়ে আমার সামনে বসে, তাতে আনন্দ ছাড়া নিরানন্দের কোনো কারণ নেই।

শেক্সপিয়ার ছোটঘরের ছেলে ছিলেন। বেন জনসন, ওয়াট, জাসিয়া ওয়েজউড (Josea Wedgewood) নিম্নশ্রেণীর লোক হতে উদ্ভূত। বার্নস্ লাঙল চষতেন। কিট্স (Keats) কে ওষুধ বেচে জীবিকা অর্জন করতে হত।

পণ্ডিতপ্রবর কার্লাইল নিজকে মিস্ত্রির ছেলে বলে পরিচয় দিতে কোনোদিন লজ্জা বোধ করেন নি বরং সে-কথা বলতে তিনি বিলক্ষণ গৌরব অনুভব করতেন। মিস্ত্রির ছেলে বলে কার্লাইলের বড় হবার পথে কোনো অন্তরায় আসে নি।

ভদ্র যিনি তিনি সহজে ক্রুদ্ধ হন না, আঘাত পেলেও অনেক চিন্তা করে দেখেন তাঁর কোনো অপরাধ হয়েছে কিনা; মানুষকে ব্যথা দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। দুঃস্থ মানুষকে দেখলে তাঁর মনে বেদনা উপস্থিত হয়। তিনি সাধ্যমতো পীড়িতের বেদনা দূর করতে চেষ্টা করেন। ভদ্র যিনি তাঁর কথা বড় মধুর, প্রকৃতি অতি অমায়িক, ক্ষতিস্বীকার করেও নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। তিনি সত্যপ্রিয়, তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। পরনিন্দা করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন। তিনি পরের চোখে দেখেন না, বা পরের কানে শোনেন না। তিনি সাধ্যমতো কারো কাছে কোনোকিছু প্রার্থনা করেন না। সর্বদা প্রতিবেশী, বন্ধু ও আত্মীয়জনের সংবাদ নেওয়া তাঁর স্বভাব। খোদার ওপর নির্ভর করা তাঁর অভ্যাস, মানুষের মন খুশি করার জন্য তিনি অন্যায় কথা বলেন না। সৎসাহস তাঁর স্বভাবের ভূষণ। তিনি ভদ্রতা দেখাবার সময় জাতি বিচার করেন না।

তুমি যে-জাতিই হও না, ভিন্নজাতির লোকের প্রতি তোমাকে অভদ্র হতে হবে কেন? তোমার মনুষ্যত্ব, তোমার জ্ঞান দেখেই মানুষ তোমার ধর্ম ও সমাজকে সম্মানের চোখে দেখবে।

হযরত মোহাম্মদ (দ.) যে এত মানুষকে মুসলমান করেছিলেন , সে কিসের বলে? তাঁর মনুষ্যত্ব, তাঁর আশ্চর্য ভদ্রতা মানুষের মনকে মুগ্ধ করে দিত। বস্তুত হযরত মোহাম্মদের (দ.) জীবনে তাঁর ভদ্রতা ছিল এক আশ্চর্য জিনিস। তাঁর স্নেহ, তাঁর সহনগুণ, তাঁর স্বভাবের অনন্ত মাধুরী মানুষকে পাগল করে দিত।

শুধু মুখের কথার মধ্যেই ভদ্রতা নিবদ্ধ নয়। ভদ্রব্যক্তি সর্বদাই সহৃদয় ও স্নেহশীল। তুমি সর্বদা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দাও, তোমার কথার কোনো মূল্য নাই, স্বতন্ত্র হয়ে নিজের মতো নিজে বাস করাতেই তোমার আনন্দ হয়, প্রতিবেশী মারা গেলেও তুমি সেদিকে ফিরে তাকাও না—তোমার ওষ্ঠের মৃদু-মধুর হাসি অভিবাদনের কোনো মূল্য আছে বলে মনে হয় না। বাইরেটা রূঢ় রেখেও যদি তোমার অন্তরের মানুষটিকে মধুর সরল বিনয়ী করে তুলতে পারতে, তবে তাই সুন্দর হত।

কামান-গোলা যতকিছুই আয়োজন কর না, তুমি তোমার জাতিকে পতন ও দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। জাতির মনুষ্যত্বই তার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। যে-জাতির মধ্যে নীচতা, হৃদয়হীনতা ও অজ্ঞানতা পরিপূর্ণরকমে বিরাজ করছে, তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্যত্বকে যারা শ্রদ্ধা করতে শেখে নাই, তাদের স্বাধীনতা পাবার কোনো অধিকার নেই। মনুষ্যত্ব মানবজীবনে উচ্চাঙ্গের ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষের প্রতি প্রেম, দেশের আর্তপীড়িতের প্রতি মায়া, অত্যাচারিত ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি যার নাই, তিনি ভদ্রলোক নন। যে-জাতির মধ্যে ভদ্রতা নাই, যারা পাপ ও অন্যায় করতে লজ্জাবোধ করে না, যারা মানুষের স্বার্থ অপহরণ করতে ব্যস্ত, তাদের বেঁচে থাকা না-থাকা একই কথা।

জগতের এই-যে কর্মব্যস্ততা, মানব-সুখের জন্য এই-যে শত আয়োজন, এই-যে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার—সবার উদ্দেশ্য জাতির প্রত্যেক মানুষকে ভদ্র ও মানুষ করে তোলা। যাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে তিনি ভদ্র। মানবের কল্যাণ হয় কিসে? সত্য-সাধন নিয়ত মধুর বিনয়ী জীবনে। যে-জীবনে ভদ্রতার পরশ নেই, সে যতই কেন ধর্মকাজ করুক না, তার মূল্য খুব কম। সেই ব্যক্তিরই ধার্মিক বলে পরিচয় দেবার অধিকার আছে, যার অন্তর-বাহির ভদ্র, সুন্দর ও সত্য।

মানুষকে কোনো বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান করে বিশেষ কোনো লাভ আছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারি না। মানুষকে সুন্দর, মহৎ ও প্রেমিক হতে বলাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারকের কাজ।

যে দুঃখ করে, যে ভয় করে, যে অনবরত হায়-হায় করতে থাকে, তার অভিশপ্ত জীবন জগতের দুঃখ বর্ধন করে।

যদি পাপ অন্যায়ে জীবন কলঙ্কিত হয়ে থাকে, যদি কারো প্রতি কোনো অবিচার করে থাকো, যদি সত্যপালন করতে পরাজিত হয়ে থাকো, তাহলেই তোমার দুঃখ হতে পারে। আর কোনো কারণেই তোমার মুখ ভার করবার দরকার নেই। অনন্ত মানুষকে নত মাথায় নমস্কার করে হাসি ও গানের আনন্দে তুমি জীবনের পথে অগ্রসর হও। হিংসা,

পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার তোমার ভিতর হতে দূর হোক। মানুষের বুকের সঙ্গে বুক লাগিয়ে প্রেম ও পুণ্যের গান গাও।

মানবজীবনে যতই দুঃখ-বেদনা থাক না, আনন্দের সঙ্গে তা বরণ করে নিতে হবে। মুখের হাসি, চিত্তের স্ফূর্তি, সরল আলাপ সকল বিপদ-আপদকে দূর করে দেয়। জীবনে নিরানন্দের কিছুই নাই—এ জীবন আনন্দপ্রবাহের একটা বিরাট বন্যা। জীবন-আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে, আল্লার নামে কেবল হাসতে থাকো—ঐ মেঘ উড়ে যাবে।

সলোমন (Solomon) বলেছেন—যার প্রাণ স্ফূর্তিতে ভরা, তার মুখখানি দেখলে প্রাণের দুঃখ-গ্লানি দূর হয়। সে শুধু নিজের আনন্দে নিজেই মশগুল থাকে না, যারা তার আত্মীয়, যারা তার বন্ধু, তাদের প্রাণেও তাকে দেখে সাহস ও শক্তি আসে। উল্লাস ও আনন্দ যার প্রাণভরা সে শুধু আমাদিগকে বলে— জীবনে দুঃখের কোনো কারণ নেই, পরাজয়ে কোনো বিষাদ নেই, অভাবে কোনো শঙ্কা নেই, মৃত্যুতে কোনো অশ্রু নেই—এসো আল্লার নামে আমরা আমাদের দুঃখের বোঝা মাটিতে নামিয়ে রাখি; সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে তাঁর আদেশগুলি পালন করি, মানুষকে যথাসম্ভব সুখ ও আনন্দ দিই।

আনন্দহীন জীবনের ভার বইবার মতো দুরবস্থা মানবজীবনে আছে কি? ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, ঋণভারে মাথা নত হয়ে পড়েছে, মানুষের কড়া কথা শুনে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে, যা সম্পত্তি ছিল সব বেরিয়ে গিয়েছে—এসব ভেবে কাঁদলে চলবে না। যতদূর সম্ভব মানুষের কাছে নত হয়ে নিজের ত্রুটি স্বীকার কর, দীনাবস্থাকে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, হায়-হায় করো না। তাতে কোনো লাভ হবে না, জীবনের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে—জীবনসমস্যার কোনোই মীমাংসা হবে না।

আনন্দ-উৎফুল্ল মুখের শক্তি অসাধারণ, সমস্ত বিশ্বই তার বন্ধু। তার সকল বিপদের মীমাংসা হয়ে যায়। সে কারো সঙ্গে উগ্র হয়ে কথা বলে না। প্রতিবাদ করতে হলে সে কখনো ধৈর্য হারায় না, মানুষের মতের প্রতি সে শ্রদ্ধা পোষণ করে, কথায় ও ব্যবহারে সে কখনো দাম্ভিকতার পরিচয় দেয় না।

একটা মধুর কথা, একটু স্নেহের হাসি, ক্ষুদ্র হলেও মানুষের কাছে তা অতি বড় দান। মানবজীবনকে মধুময় করে তুলবার আর শ্রেষ্ঠ উপায় কী আছে জানি না। দেশ ও জাতির মধ্যে একটা মহাবিপ্লব ও পরিবর্তন এনে নিজকে শ্রেষ্ঠ করে তুলবার বাসনা করবার কোনো দরকার নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ-মমতার কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহানুভূতির উপহারে তুমি তোমার জীবনকে মধুর ও শ্রেষ্ঠ করে তোলো, তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। দেশপূজ্য মহাপুরুষ হবার কোনো দরকার নেই। তোমার ক্ষুদ্র সমাজে, তোমার ছোট গ্রামে, তোমার বন্ধুমহলে তুমি একজন আদর্শ ভদ্রলোক হও। বেশিকিছু দরকার নেই। সমুদ্র তরঙ্গ তুলে ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে প্রাণে ভীতি, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে সত্য; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শীতল বারিস্রোতগুলির কি কোনো সার্থকতা নেই? তারা কলকল করে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যায়, ক্লান্ত পথিক অঞ্জলি ভরে তার সুশীতল জল পান করে।

মানবজীবনে সহানুভূতি একটা শ্রেষ্ঠ গুণ। যিনি ভদ্রলোক, তাঁর প্রাণ সহানুভূতিতে ভরা থাকবেই। যিনি মানুষকে সহানুভূতি দেখাতে অভ্যস্ত নন, তাঁকে ভদ্রলোক বলতে মন কুণ্ঠাবোধ করে।

নিজের সুখ-দুঃখে, নিজের উন্নতি নিয়ে আমার চিত্ত সর্বদা ডুবে আছে, যাদের মধ্যে বাস করি, যারা সর্বদা আমার আশেপাশে ঘোরে, যারা আমার প্রতিবেশী, যারা আমার জীবন-সংগ্রামে অনেক আঘাত সয়েছে; তাদের প্রতি কি কোনো কর্তব্য নাই? এ জগতে নিজের কথা নিয়ে সবাই ব্যস্ত, পরের কথা ভাববার মতো প্রাণ তোমার হওয়া চাই। পরের জন্য সর্বস্ব তুমি দান কর—এ আমি বলছিনে। হাজী মহসীন বা ফরাসি দেশের প্রাতঃস্মরণীয় গেয়োর মতো ত্যাগ-মহিমায় তোমার জীবন উজ্জ্বল হোক, এতবড় কথাও আমি বলতে চাইনে। আমি চাই তোমার প্রাণ নিজের মধ্যেই যেন ডুবে না থাকে। এমন করে আত্মাকে বিনষ্ট করে ফেললে তোমার মনুষ্যত্বের প্রতি খুবই অবিচার করা হবে। রেলস্টেশনে বিপন্ন ভদ্রলোকের বাক্সটি যদি ধরে তুলে দাও, তাতে তোমার ক্ষতি হবে না। শহরের রাস্তায় অপরিচিত সরল পথিককে হাসিমুখে তার পথের সন্ধান বলে দেওয়া তো দোষের কথা নয়। পথের ধারে যে পড়ে গিয়েছে, তার ব্যথিত অঙ্গে হাত বুলিয়ে দেওয়া লজ্জার কথা নয়—হোক সে যে-কোনো জাতির লোক।

ক্ষিপ্ত উন্মত্ত ঘোড়ার বল্গা চেপে ধরে তুমি সাহসিকতার পরিচয় দাও—এও আমি বলছিনে। রাস্তার পার্শ্বে যে রোগজীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দুয়ারে হাত পেতে বসে আছে, তার পানে কি একটা প্রসন্ন দৃষ্টিও নিক্ষেপ করা যায় না? ভিখারিনী নারীর শুষ্কমুখে শিশুর গায়ে কি একটি স্নেহের হাত বুলানো যায় না? প্রখর রৌদ্রে দুর্বল মানুষটি তার মাথার ভার নিয়ে কিছুতেই অগ্রসর হতে পারছে না, সেই ভারটি নিজের ঘাড়ে ফেলে যদি তাকে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসো, তাতে তোমার পোশাকের কোনো অসম্মান হবে না।

যে-জাতির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা নেই, যারা মানুষকে সহানুভূতি দেখাতে বড় কৃপণ, তারা কত ছোট! আমার সঙ্গে ওর পরিচয় নাই, সুতরাং ওর ব্যথায় আমার ব্যথা বোধ করার দরকার নাই—এ মনে করা কি খুব ভালো! সে মানুষ—আমার সহানুভূতি পাবার জন্য এরচেয়ে আর বড় দাবি কী হতে পারে?

অবুঝ ছেলে বা কোনো অনভিজ্ঞ ক্রেতা এসে দোকানে জিনিস চেয়েছে—আমি কি তাকে ঠকাতে পারি? আমার সুবিধার প্রতি যদি নজর রেখে ক্রেতার প্রতি অবিচার করি, তাতে আমার ভিতরের মানুষটি লজ্জাবোধ করবে না?

অপরের প্রতি অবিচার করে মানুষের দুঃখব্যথার প্রতি উদাসীন হয়ে নিজের সুখ-সুবিধাটুকু আদায় করে নিতে ভদ্রলোক সবসময়ে লজ্জাবোধ করেন। এরূপ সুবিধা তাকে মোটেই আনন্দ দেয় না।

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল যদি আমরা হই, তাহলে মানবসমাজে কত সুখ বেড়ে যায়। অপরের ভাব ও দুঃখব্যথা যদি আমরা নিজের মতো করে অনুভব করতে শিখি, তাহলে মানবসমাজে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবার ষোলো আনা আনন্দ হতে বঞ্চিত হব।

ভদ্রলোকের ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কত উচ্চস্তরের লোক! তার কথা ও কাজ সর্বদাই সুন্দর। ধর্মজীবন তার স্বতন্ত্র নয়। একশ্রেণীর লোক আছেন যারা ধর্মজীবনকে নিজের কথা ও কাজ হতে স্বতন্ত্র করে গ্রহণ করতে চান। ধর্মজীবন অর্থ শুধু উপাসনা করা নয়। মানুষের সাথে ব্যবহার যদি নির্মল ও মধুর না হয়— তবে আমরা নিত্য যত রকমের জীবনের কাজ সমাধান করি, তা যদি অন্যায়ের কলঙ্ক হতে স্বতন্ত্র করে না রাখতে পারি, তাহলে আমাদের ধর্মপালন ঠিক হবে না। যে জীবন পাপ, অন্যায় ও মিথ্যায়

পরিপূর্ণ হয়ে আছে তার ধর্মকার্য করতে যাওয়া একটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই না। জীবনের কাজগুলিই একপ্রকার উপাসনা। যথার্থ ধার্মিক-পুরুষ কি অভদ্র নীচ, শঠ ও প্রতারক হতে পারেন? মানুষকে ঠকিয়ে তিনি কখনো মসজিদে যেতে সাহস পান না। ধর্মকে স্বতন্ত্র করে দেখা তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষের মনের অধঃপতন ঘটে। অনুন্নত চিত্তের মানুষ মনে করে খোদার দয়া ভিক্ষা করলেই তার সঙ্গে প্রেম করা হয়—এবাদত করলেই ধর্মজীবনের কর্তব্যগুলি শেষ হয়। আসলে তা হয় না। আল্লার সঙ্গে প্রেম করার অর্থ—আমাদের জীবনকে সবপ্রকারের কলঙ্কমুক্ত করে তোলা। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি কেন? —আমার অন্যায়, আমার নীচতা, আমার পাপকে ঢাকবার জন্য। মানুষের মাথায় বাড়ি দেওয়া, পরের ঘরের সিঁধ কাটাই যে জঘন্য জীবনের একমাত্র নিদর্শন তা নয়। ধার্মিক মানুষকে খুব উঁচুতে উঠতে হবে। তাকে মানুষ হতে হবে, তাকে যথার্থ ভদ্রলোক হতে হবে, প্রতি কাজে কথায় তাকে সতর্ক হতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি দিয়ে দীর্ঘজীবনের ঘর গড়া হয়। ভাঙা পুরনো ইঁট, খারাপ সুরকি দিয়ে যেমন ভালো ঘর হয় না, তেমনি ছোট ছোট অন্যায় কাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীচ ব্যবহার আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ ও সুন্দর করে তুলতে পারে না।

ভদ্রলোক যিনি, তিনি ভদ্রলোকের সম্মান বুঝে থাকেন। ভদ্রলোক যেমন নিজের সম্মান বোঝেন, অন্যের সম্মান ঠিক তেমনি করে বোঝেন। তাঁর সম্মুখে যদি কোনো ভদ্রলোকের অপমান হয়, তিনি নীরবে তা সহ্য করতে পারেন না। বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে থাকলেও ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বন্ধু। মুহূর্তের মাঝে তাদের মধ্যে পরিচয় হয়ে যায়। যে নীচ ও দুর্বৃত্ত, সে নিতান্ত আপনার জন হলেও ভদ্রলোক তাকে আপনার জন বলে স্বীকার করতে ইচ্ছা করেন না। নিজের অসুবিধা হলেও ভদ্রলোক ভদ্রলোকের সুবিধা করে দিতে আনন্দ বোধ করেন। ভদ্রলোক চিরকালই গুণগ্রাহী, ছোট চিরকালই ছোট হয়ে থাকবে। পাছে নিজের সম্মান নষ্ট হয়, এই ভয়ে ভদ্রলোক মানুষের গুণ স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করেন না। তিনি ইচ্ছা করেন, যে গুণী তাঁর সম্মান ও আদর হোক। যেখানে গুণের আদর হয় না, যেখানে ন্যায় সত্যের অসম্মান হয়, ভদ্রলোক সেখানে প্রাণে দুঃসহ দুঃখ বোধ করেন।

মানুষের মন যখন ছোট হয়ে যায়, যখন গুণ ও মনুষ্যত্ব অপেক্ষা বাইরের চাকচিক্যকে মানুষ বেশি সমাদর করে, তখনই সে অন্যায় ক্ষমতা লাভ করতে চায়। কোনো জাতির মধ্যে মানুষ যখন মানুষের গুণ স্বীকার করে না, অন্যায় ক্ষমতার জোরে উঁচু আসন অধিকার করে রাখে, তখন হতেই তাদের পতন আরম্ভ হয়। ছোটকে বড় করা, মানুষের মনুষ্যত্বকে সমাদর করা এবং প্রয়োজন হলে নিজে নিম্নাসনে বসাই শ্রেষ্ঠ মানুষের কাজ।

খলিফা আলী (রা.) যখন মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন তখন সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি জনমণ্ডলীকে বললেন—আমার চেয়েও যদি কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্ধান আপনারা পান তবে তাঁকেই সিংহাসনে বরণ করে নিন। আপনাদের আদেশ আজ আমি গ্রহণ করলাম, কিন্তু যখনই উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাবেন, তখন যেন আমাকে বাদ দেওয়া হয়। হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন যথার্থ ভদ্রলোক। তাঁর মধ্যে যে মহত্ত্ব, মনুষ্যত্বের গরিমা ছিল, তার তুলনা কোথায়!

ভদ্রলোক সব সময়েই ভদ্র। তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করতে ভালোবাসেন। তিনি শ্রদ্ধা করে মানুষকে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের পথে আকর্ষণ করেন। তাঁর মুখের স্থিরগাম্ভীর্য,তাঁর দৃষ্টি, তাঁর

কথার আশ্চর্য ভঙ্গি মানুষকে আশ্চর্যরকমে উন্নত করে তোলে, তিনি উগ্র কঠিন হয়ে কারো কাজের সমালোচনা করেন না। তাঁর স্পর্শ, তার সঙ্গ, আত্মার উপর মহত্ত্বের আলোক ছড়াতে থাকে। তাঁর হাসিটুকু মানুষের মনে স্বর্গের কিরণ এনে দেয়। তিনি কাপুরুষ নন, অথচ তাঁর তেজ কখনো উগ্র-ভীষণ হয়ে দেখা দেয় না। তিনি বিপদে ধৈর্য ধারণ করেন, ঝঞ্ঝার মাঝে তিনি আশা-আনন্দ ও শান্তির অমৃত বর্ষণ করেন।

ভদ্রলোক কখনও নীচ নন। মনের স্বাধীনতা রক্ষা করতে তিনি সদাই ব্যগ্র। মনের স্বাধীনতা যেখানে থাকে না, সেখানে তিনি অগ্রসর হন না। তাঁর বহু টাকা ক্ষতি হয়ে যাক, জীবনে দুঃখের মাত্রা বেড়ে উঠুক, অভাবের বেদনা তাঁকে চেপে ধরুক, তবুও তিনি তাঁর চিত্তের অবমাননা সহ্য করতে পারেন না।

রাণা প্রতাপ যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পুত্র-কন্যাদি নিয়ে বনজঙ্গলে আশ্রয় নিলেন, তখনকার অবস্থা একবার চিন্তা কর। যার সুখের অন্ত ছিল না, সম্মান রক্ষার জন্য তিনি কত দুঃখ ভোগ করেছিলেন। সম্রাট আকবরের কাছে একটা বশ্যতা স্বীকার করলে তাঁকে এত কষ্ট পেতে হত না। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান রয়েছে, তিনি জানেন চিত্তের স্বাধীনতার মূল্য কত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মরে যাই সেও ভালো, তবুও নিজের অমর্যাদা দেখতে ভদ্রলোক পছন্দ করেন না। বাদশাহ আকবর গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি রাণাকে সম্মান করেছিলেন। সম্রাট আকবর ভদ্রলোক ছিলেন। রাণাও ছিলেন ভদ্রলোক, তাই ভদ্রলোকের কাছে ভদ্রলোকের অবমাননা হয় না। হিন্দু হলেও রাণার মনের উচ্চতা কি মুসলমানের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য নয়?

দুটি পয়সার জন্য যিনি নীচতার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না, নিজের সম্মানের কথা ভুলে একটুখানি ক্ষতি স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন, যার জীবনের মর্যাদা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নাই, তিনি কিরূপ ভদ্রলোক? বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা আছে, অনেক বড় লোক তোমার বন্ধু, তোমার মাসিক আয় হাজার টাকা, তুমি গাড়ি-ঘোড়ায় চড়; কিন্তু তুমি কাপুরুষ—মানুষ অসন্তুষ্ট হবে, নিজের আর্থিক ক্ষতি হবে ভেবে তুমি তোমার সত্য প্রকাশ করতে ভয় পাও—তুমি কি ভদ্রলোক? জানো না, মনুষ্যত্বের কাছে সংসারের অর্থবৈভবের মূল্য এক পয়সাও নয়! অসত্য ও অন্যায়কে মেনে নেবার বেদনা ভদ্রলোক কখনো সহ্য করতে পারে না।

ভদ্রলোক জ্ঞানের সেবক। দুনিয়ার পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে তিনি যোগ না-রেখে পারেন না। কোন্ মহাপুরুষ কী বলে গিয়েছেন, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কী নূতন কথা বলেছেন, এ জানবার জন্য তাঁর মনে একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা থাকবেই। পুস্তক পাঠ করা, দেশের খবর রাখা তাঁর জীবনের একটা বড় কর্তব্য। সাংসারিক আপদ-বিপদে তাঁর মন অবসন্ন হয়ে যেতে পারে, ব্যাধির প্রকোপে শরীরে স্ফূর্তি না থাকতে পারে, নানাপ্রকার দুর্বিপাকে সময়ে সময়ে তিনি নিজেকে নিঃসহায় মনে করতে পারেন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জ্ঞানালোচনাকে তিনি বাদ দিতে পারেন না। উহা তাঁহার রোগশয্যার পরম বন্ধু, দুঃখের মাঝে আশা, বিপদের সান্ত্বনা, ধর্ম-জীবনের অবলম্বন।

জগৎ, দেশ ও সমাজের যিনি খবর রাখেন না, চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলীর চিন্তার সঙ্গে যার যোগ নাই, তিনি নিজের আভিজাত্যের গৌরব করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মূর্খ জীবনের মূল্য খুব কম। ভদ্রলোক বলে যিনি পরিচয় দিতে যাবেন, তাঁকে বিচক্ষণ হতে হবে। বিশ্বের

কোনো খবর রাখি না, জাতির চিন্তার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নাই, নিজের চিন্তা নিয়ে ডুবে আছি; আমার জীবনের বিশেষ মূল্য কী? ভদ্রলোক যিনি তাকে জীবনভর শরীর পোষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকেও খোরাক জোগাতে হবে। শরীরের স্বাস্থ্যই শুধু স্বাস্থ্য নয়। দীনহীন আত্মাকে ঘিরে যদি একটা মূল্যহীন শরীর বেঁচে থাকে, তবে তাতে আনন্দ করার বিশেষ কিছু নেই। দুর্বল শরীরে উজ্জ্বল আত্মা বহন করা বরং ভালো কিন্তু সুস্থ দেহে অন্ধ আত্মার বহন করা বড়ই লজ্জাজনক। জীবনের বহু অভাবকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি; কিন্তু পুস্তক, জ্ঞানীগণের অমূল্য উপদেশ, চিন্তাশীল পণ্ডিতের চিন্তাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুতে বেঁচে থাকতে পারিনে। একদিন না-খেয়ে থাকা উত্তম কিন্তু জ্ঞানীগণের সঙ্গে সংস্রব না-রেখে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ভদ্রলোকের পক্ষে নিতান্তই অশোভন। আমরা যেমন শরীরকে নিত্য আহার দিচ্ছি, আত্মাকেও তেমনি নিত্য জ্ঞানের খোরাক দিতে হবে। জ্ঞানের সঙ্গে যোগ না-রেখে, যিনি হাসি-খেলা করে সংসারের সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জীবনটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন, তিনি কিরূপ ভদ্রলোক!

শুনেছি অতীতকালে মহৎ ব্যক্তিরা নাকি ভাঁড়ে ভাঁড়ে টাকা দান করতেন। অনবরত যাকে-তাকে টাকা দান করলে বিশেষ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হয় না। ভদ্রলোক দরিদ্র ও দুঃখী মানুষকে অর্থ দান করেন নামের জন্য নয়—সেরূপ না করে তিনি পারেন না। যার অর্থের আবশ্যকতা নাই, অথবা যেখানে দান করলে মানুষের প্রকৃত উপকার হয় না সেখানে অর্থ দান করবার দরকার নাই। দয়া প্রদর্শনে অথবা দানকার্যে অত্যধিক হিসাব-তর্ক করাও ভদ্রতা নয়।

ভদ্রলোকের প্রাণ দয়া-প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি বাড়ির কুকুর-বিড়ালের প্রতিও বিবেচনাশীল। নিষ্ঠুরতা বা অন্যের ভাব ও দাবির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা তাঁর স্বভাবে ভালো লাগে না। তিনি যেমন নিজের সুখসুবিধার প্রতি মনোযোগী, অন্যের প্রতিও ঠিক তেমনি মনোযোগী।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অভ্যর্থনা নং
বাংলাদেশ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র